আদিত্য প্রকাশালয়
২. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় প্রকাশ —
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮

প্রকাশক —
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২৮, জাষ্টিস্ মন্মথ মুখার্জী রো
কলিকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর —
অন্নপূর্ণা পাল।
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা—৬

উপহার

—এতে যা আছে—

মায়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে। বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেছে সিঁদরাণির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী-বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই। দুখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘী চুরি আমি করিনি। কে করেছে আমি জানিও না। অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজের-ডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েছে। জোয়ান বয়স, হাতে কিছু পয়সা থাকলেও খাবারের দোকান এ পর্যন্ত এইসব অজ-পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়লো না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা-শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণ ভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ। গরমও বেশ পড়েছে, স্নান করে সত্যি ভারী তৃপ্তি হলো। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুল গাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল বটে, কিন্তু পেট সমানে জ্বলছে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই। চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসছে দেখা গেল। আমাকে দেখে বল্লে—বাড়ী কোথায়?

আমি বল্লাম—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েছে। খাবো কোথায়, তিনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বল্লে—রোসো নেয়ে নি। সব ঠিক করে দিচ্ছি।

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরানো বাড়ীতে ঢুকলো। বল্লে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ী আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ী পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি? আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ী দেখাশুনা করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত বড় বাগান আছে বাড়ীর পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বল্লাম—থাকতে পারি। কি কাজ করতে হবে?

—রাঁধুনীর কাজ। যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই!

—খুব ভালো।

আমি রাজি হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী—খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরানো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বল্লে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা আর তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরই মধ্যে বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক সুরু হোল। আমি বাড়ীর বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরানো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল! কোনো লোকের বাড়ী নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেওয়াল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্ছে।

আমায় বল্লে—চা করতে জান? একটু চা করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বল্লে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘী আছে, আলু ভাতে ভাত—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে।

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এই বেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জ্বেলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে। অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলছি।

মস্ত বড় বাড়ী। ওপরে নীচে বোধহয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় রোয়াক। রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকেল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধু হাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে। বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে, অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেছে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনা-সামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচু হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মত ঝিঙে তুলছে। দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। তারপর পেছন ফিরে সাত আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলছে।

নিবারণ চক্কত্তি বল্লে—ঝিঙে পেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বল্লে—কোথায় ?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষ মানুষ ?

—না, একটা বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল! বল্লে—কোথায় বৌ ? চলো দিক দেখি।

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি কিছুই না।

নিবারণ বল্লে - কৈ বৌ ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ওই ঝোপটার কাছে।

হুঁঃ, যতো সব! চলো, চলো। দিন দুপুরে বৌ দেখলে অমনি।

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে এত খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে ?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা ওল্লে। বল্লে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে ? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে ? কেন তা যাওনি ?

আমি বুঝলাম না, কি তাতে দোস হল। বুড়োটা খিট্‌খিটে ধরণের। বিনা আলোতে আমি যখন সব দেখতে পাচ্ছি, এমন কি ঝিঙে চুরি করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষটা করেছি কি ?

বুড়ো বল্লে—না, না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন ?

—তাই বলছি। তোমার বয়স কত ?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই ভেবটি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি. ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল! জিনিষপত্র টানাটানির শব্দ! কে বা কারা যেন বাক্স বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্ছে! ভারী জিনিষ সরাচ্ছে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধহয় জিনিষপত্র গোছাচ্ছে! কিন্তু এত রাত্রিতে ?

বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ।

সকালে উঠে বুড়াকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বল্লে আমি ?

—হ্যাঁ. অনেক রাতে!

—ও। হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।

—আমাকে বল্লেই হতো আমি গুছিয়ে দিতাম।

চক্কত্তি বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা ন'টার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙে ভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পৌটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার-বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মতো থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরি-তরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হলো দেড় বিঘের ওপর। লোক-অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ী ভাববে। দেখা-শুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি ?

চক্কত্তি বুড়ো অকারণে স্বর খাটো করে বল্লে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ী দেখাশুনা যেমন করবে,

নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইলো তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ীর বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েছে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়ীতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিছে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চাল আছে গাছ-ভরা আম কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়লো হঠাৎ।

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবো বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপরে, কি বন জঙ্গল গাঁখানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ী, তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ-মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্ছে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বল্লে—বাড়ী কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ী।

—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?

—দেখাশুনো করি। কাল এসেছি।

—ও বাড়ীতে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়ীতে এল গেল। ওরা নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ওর বাড়ীর ছেলে-বৌয়েরা কস্মিন্ কালে ও বাড়ীতে আসে না। কেন জান?

—তা কি জানি।

—ও বড় ভয়ানক বাড়ী। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিষ কিনে বাড়ী ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়ীখানা দেখে

আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়ীখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মত ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে! অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল নুন কিনতে যাই, তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল- হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই লোকটির ভয় দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার। চক্কত্তি খুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না গাছপালার ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোকে চুরি করে খায় কিনা। বাড়ীতে একজন পাহারাদার বসালে লুটপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয় সেই জন্যই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যা-বেলা ঝিঙে চুরি করছিল।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা-রোজগারের এমন সুযোগ কখনো ঘটেনি! নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না, মিটে গেল কাজ—সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপন মনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ীর আমিই মালিক! কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে পড়ে—বেশ মোটা ধারে জল পড়তে লাগলো। তখনই আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়ছে - সমানে মোটা ধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তি মশাই নিয়ে গিয়েছে, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়ছে?

মিনিট দশেক জল পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কত্তি মশায় বোধহয় কোনো কলসী ঘড়াতে জল রেখে

গিয়েছিলেন ওপরের বারান্দাতে সেই কলসী কি-ভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে! নিশ্চয়ই তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানালা দিয়ে সুন্দর জোৎস্না এসে পড়েছে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসছে! বেশ সুবাস ফুলের!

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবছি এমন কোনো সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ীর কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি? জানালার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হাঁ, স্পষ্ট দেখেছি—ভুল হবার নয়। আমি তখনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন। ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ। না, এ কোন ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসছে না।

কেমন এক রকম যেন লাগছে! এক রকম নেশার মতো। কেন আমি বাইরে এসেছি! ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সেই ছড়িয়ে গিয়েছে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়?

সে রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারি আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে এত কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন এক সঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি। আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিল-খিল করে হাসি নয়—খল্-খল্ করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি কিছুই না। জানালা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দী জানালা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেমে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার কি? কোন বদমাইস লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি, দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলছে।

আমার ভয় হয়নি। কেন না দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো এ সময়ে মনের মধ্যে কোনো ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধহয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেছে, যত ইচ্ছা তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ী, আমারই ঝিঙেলতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝছি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিষ এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরের কোনো শব্দ আসে কি না, শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়ে-দেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনছি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলছে, হাসছে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনছি, যেমন কোনো বিয়ে-বাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দও ঘুমের মধ্যেও পাওয়া

যায়! হয়তো সবটাই আমার মনের ভুল! মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে তারই ফল।

এরপর ন'দিন আর কোন কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিষগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ও-সব কিছুই না, কি শুনতে কি শুনেছি, বৌ-দেখা চোখের ভুল, হাসি-শোনাও কানের ভুল! সব ভুল!

এ ন'দিন আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই, আর শুধু ঘুমুই। কাজকর্ম কিছু নেই—কেমন এক রকমের কুঁড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে! আমি সাধারণতঃ খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন এক ধরণের অবসাদ এসে গিয়েছে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েছে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়ীতে কাজ করে সুখ আছে; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি— আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেছে, নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলছে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জন পঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানালা যেন একটা ঝড়ের ঝাপটা লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের

রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম—কৈ, একটা দরজা জানালার কপাটও খোলেনি দোতলার। যেমন, তেমনি আছে।

বাপরে কি? বাড়ীটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেছি এই মাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোন শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেছে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারী মজার ঘটনা বটে।

খেয়ে দেয়ে সবে শুয়েছি, সামান্য তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল! চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চারিপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে এক রকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েছে, এই রকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরসিতে যেন একটা মুখই দেখছি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেছে।

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ী আছে অনেকদিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়ীটা। তবে শুনেছি, যারা দেখতে জানে, তারা বলে, সেই বাড়ীর মধ্যে একটা লোক রয়েছে।

—সব মিথ্যে। কোথায় বাড়ী?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপরে বাপ। কথায় বলে ভূতের নেত্য। শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড। অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিলে, আমার

দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা।

আমার বিছানার বা আমার কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওরা আদৌ যেন সচেতন নয়! ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল তখন শেষ রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানালা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েছে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতনভাবে জানালার বাইরের জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানিনে, ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করছি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়ে দেয়ে পরম আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েছি, তা কোথা থেকে এলো? সেই বৌটি যখন চলা-ফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েছে।

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েছি দোকানে, দোকানী বল্লে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখেছো নাকি?

—না।

—শুনছো কিছু?

—না।

—তুমি দেখছি সাধু লোক। ঝুক-তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর?

—তেল দাও, চলে যাই। ও সব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনোদিন ভাখোনি? বৌ মত? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

খুব বেঁচে গিয়েছ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ী ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেতো। ছুটি লোকের এই রকম হয়েছে এ পর্যন্ত। বাড়ীতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়। তারপর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ী—না খেয়ে, না দেয়ে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না। তুমি দেখছি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ীর ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমার হোল নাকি? বাড়ীর সীমানায় পা না দিতেই আমার মনে হোল, সব ভুল। পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাব? বেশ আছি। খাসা আছি। তোফা আছি।

সেই থেকে আজ দু'বছর আছি এ বাড়ীতে। চক্কত্তি মশায় মাইনে টাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ী দেখাশুনা করি, বেগুন কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক পা যাইনে বাড়ী ছেড়ে।

আগন্তুক

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আমাদের গ্রামখানি অনেকটা উপদ্বীপের মত। তার পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে আর একটি বড় নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে। পৃথিবীর মাটির সঙ্গে আমাদের গ্রামের অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে কেবল দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু সে যোগটুকু না থাকলেও আমরা হয়তো দুঃখিত হতুম না। আমাদের গ্রামের উত্তর প্রান্তে নদীর কিনারায় যে শ্মশান আছে, এ অঞ্চলে তার চেয়ে বড় শ্মশান আর নেই এবং সেই শ্মশানে শবদাহ করবার জন্যে দূর গ্রাম থেকেও লোক আসে ঐ দক্ষিণ দিক দিয়েই। এখানে যে শ্মশানেশ্বর মহাদেব বিরাজ করছেন, তিনি নাকি অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা—যদিও তিনি যে নিদ্রাগত না হয়ে অহরহই জাগ্রত হয়ে আছেন এমন কোন প্রমাণই আমরা পাই নি। কিন্তু অধিকাংশ লোক সেই কথাই বিশ্বাস করে, অতএব দেবতার মহিমায় এখানকার শ্মশানটি পরিণত হয়েছে মহাশ্মশানে। শবযাত্রীদের অস্বাভাবিক ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ থেকে ঘন ঘন হরিবোল ধ্বনি উঠে আমাদের গ্রামের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তোলে যখন-তখন। দিনের বেলায় সেই সোরগোল কোনরকমে সহ্য করা যায়, কিন্তু নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সে চীৎকার অমানুষিক হয়ে চতুর্দিকে সৃষ্টি করে কেমন একটা অসহনীয় অপার্থিব ভাব। ঘুমন্ত শিশুরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে জেগে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। গ্রামখানি পুরোপুরি দ্বীপ হ'লে এ-সব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হ'ত না।

পল্লীগ্রামের মহাশ্মশানের ভয়াবহ বীভৎসতা কলকাতার বাসিন্দারা ধারণায়ও আনতে পারবেন না। কলকাতার শ্মশানগুলোকে তো বাহির থেকে দেখায় সৌখিন মানুষদের বসতবাড়ীর মত। তাদের

ভিতরটাও জীবন্ত জনতার আনাগোনায় ও কণ্ঠস্বরে সর্বদাই শব্দিত হয়ে থাকে, এমন কি সেখানে অমাবস্যা রাত্রির অন্ধতাও ঘুচিয়ে দেয় বছ ইলেকট্রিকের বাতি।

কিন্তু পল্লীগ্রামের মহাশ্মশান, বড় ভয়াবহ ঠাঁই! নিঝুম রাতে সেখানে পদার্পণ করলে সর্বাঙ্গে জাগ্রত হবে বিভীষিকার রোমাঞ্চ! হলুদবরণ চাঁদের পাণ্ডু আলো চারিদিকে প্রকাশ করে অস্পষ্টতার রহস্য এবং তারই সঙ্গে ছুটো-একটা হারিকেন লণ্ঠন টিম্-টিম্ ক'রে জ্বলেও স্পষ্ট করে দেখাতে পারে না কোন কিছুই। বাতাসে বাতাসে জেগে ওঠে যেন মরন্ত রোগীর নাভিশ্বাস এবং তাই শুনে চতুর্দিক থেকে কালো কালো দানবের মত মস্ত মস্ত গাছপালাগুলো শিউরে শিউরে কেঁদে কেঁদে ওঠে সভয়ে এবং সশব্দে! এখানে-ওখানে ছাড়া ছাড়া হয়ে অপচ্ছায়ার মত নড়াচড়া করে যে-সব জ্যান্ত মানুষ, তাদের সংখ্যা এক হাতের আঙুলেই গুণে ফেলা যায়। একটা কি ছুটো কিংবা বড় জোর তিনটে চিতা দূরে লক্‌লক্ ক'রে ওঠে ক্রুদ্ধ নরক-নাগিনীর জ্বলন্ত রক্ত-জিহ্বার মত। কোন বৃক্ষের অদৃশ্য শাখায় বসে অশুভ কণ্ঠে আচমকা চাঁা-চাঁা ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে একাধিক প্যাঁচা। চম্‌কে দেয় জীবন্তদের অন্তরাত্মাকে। স্থানে স্থানে রাশিকৃত ভাঙা কলসী ও মাংসহীন অস্থি প্রভৃতির সঙ্গে পড়ে থাকে কোন অগ্নিদগ্ধ মানুষের ভয়াল দেহাবশেষ—কারণ এখানে শহরের মত সব সময়ে মৃত দেহকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলা হয় না। দূরে আনাচে-কানাচে যেখানে চোখ যা-কিছু দেখে সব ছায়া-ছায়ার মত, সেখানে হয়তো মানুষের আধ-পোড়া দেহের অংশবিশেষ নিয়ে মারামারি, টানাটানি, ছেঁড়াছিঁড়ি করে শৃগাল-কুকুরের দল, বিশ্রী চীৎকারে বিষাক্ত করে চতুর্দিকে! তারও পরে আরো দূরে যেখানে যেতে নারাজ হয় মানুষের দৃষ্টি, মনে সন্দেহ জাগে, সেখানে হয়তো চলাফেরা করছে এমন মৃত মানুষের জনতা, পার্থিব জগতে ঠাঁই না থাকলেও রাজি নয় যারা পৃথিবীর মাটি ত্যাগ করতে। বন্ধ হয়ে যায় জীবন্তদের পদচালনা, স্তম্ভিত হয়ে যায় চক্ষু, মন এবং দেহ। তারও উপরে থেকে থেকে

মাথার উপর দিয়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে করতে উড়ে যায় নিশীথিনীর বৃহত্তর কালো প্রজাপতির মত অমঙ্গলকর ও নির্বাক বাদুড়ের দল। অভিধান শ্মশানের আর এক নাম দিয়েছে—'প্রেতভূমি'। এ নাম মিথ্যা নয়। পল্লীগ্রামের শ্মশান দেখলে প্রেতভূমি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

এমনি এক শ্মশান থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে আমরা বাস করি। আমাদের বাড়ী হচ্ছে গ্রামের শেষ বাড়ী। তারপর একটা ছোট মাঠ। তারপর একটা ছোট জঙ্গল। তারপরেই নদীর ধারে শ্মশান।

কৃষ্ণপক্ষের কালো রাতের জন্যে আসর ছেড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলো।

সেদিন কি বিষম গুমট! বাতাসের দম যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, নড়ছে না গাছের পাতা পর্যন্ত। ঘরের ভিতর টেঁকা দায়। বাড়ীর বাইরের রোয়াকে এসে বসলুম এবং হাত পা ছড়িয়ে ভালো করে বসতে না বসতেই শুনলুম বহু কণ্ঠের চীৎকার—"বল হরি, হরিবোল! বল হরি, হরিবোল! বল হরি, হরিবোল!"

ঝিল্লীমুখর উত্তপ্ত অন্ধকার রাত্রে এই মৃত্যুধ্বনি মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললে অশান্তি। একটু তফাতে, আমার বাড়ীর সামনে দিয়েই শ্মশানে যাবার রাস্তা। কিন্তু চারিদিকে এত অন্ধকার যে, শবযাত্রীদের কারুকেই দেখতে পেলুম না—কেবল শোনা যেতে লাগল হরিনামের সেই শব্দময় বিভীষিকা! ক্রমে তা ক্ষীণতর হয়ে একেবারে থেমে গেল। বুঝলুম শ্মশানে পৌঁচেছে শবযাত্রীরা।

শবযাত্রীদের কণ্ঠ মৌন হল বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে রাত্রের কতকগুলি নিজস্ব ধ্বনি আছে। থেকে থেকে গাছের পাতাদের ফিস্‌-ফাস্‌; হঠাৎ জেগে ওঠা পাখীদের ডানা ঝাড়া, গাছের তলায় শুক্‌নো পাতাদের ভিতরে সড়্‌-সড়্‌ শব্দ তুলে হয়তো চলে যায় কোন সাপ বা সরীসৃপ; হয়তো ডেকে ওঠে কর্কশ স্বরে একটা কি ছুটো তক্ষক; কিংবা শোনা যায় শৃগাল-সভার স্বল্পস্থায়ী হট্টগোল: এবং এই সবের

উপরেও সর্বক্ষণ জেগে থাকে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ ক'রে ঝিঁ-ঝিঁ পোকাদের একটানা আর্তনাদ !

বেশ খানিকক্ষণ ধরে একলা বসে বসে শুনলুম সেই রাত্রির ধ্বনি। তারপর চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল তন্দ্রার আমেজে। উঠি-উঠি করছি, হঠাৎ যেন অন্ধকার ফুঁড়েই একেবারে আমার সুমুখে এসে দাঁড়াল একটা সুদীর্ঘ ছায়ামূর্তি। এমন আচম্বিতে এত নিঃশব্দে তার আবির্ভাব, চমকে না উঠে পারলুম না।

শুধালুম "কে?"

অন্ধকারে দেখতে পেলুম, মূর্তির চোখদুটো চক্‌চক্‌ করে উঠল। সে অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্কস্বরে বললে,—"ক্ষুধার্ত অতিথি।"

—"অতিথি! এই রাত্রে!"

—"ক্ষুধার্তের সময় অসময় নেই। কেবল ক্ষুধার্ত নই, আমি শীতার্তও। শীতে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপছি। আগে বাড়ীর ভিতরে একটু আশ্রয় দিন—বাইরে আর দাঁড়াতে পারছি না।"

মহাবিস্ময়ে বলে উঠলুম, "বলেন কি মশাই, আপনার শীত করছে? আর এদিকে দারুণ গুমটে সিদ্ধ হয়ে আমরা মারা যেতে বসেছি!"

সে যেন কাঁপতে কাঁপতে বললে, "বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথায়, তাহলে এই দেখুন! কই, আপনার হাত কই?"

আমার একখানা হাত বাড়িয়ে দিলুম। সেও হাত বাড়িয়ে ধরলে আমার হাতখানা। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আমি শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানা টেনে নিলুম! উঃ, কি অসম্ভব ঠাণ্ডা তার হাত! ঠিক যেন জমাট বরফ দিয়ে গড়া!

সে কাতরস্বরে বললে, "বাড়ীর ভিতরে চলুন, বাড়ীর ভিতরে চলুন! আমি আর বাইরে দাঁড়াতে পারছি না!"

বাড়ীতে ঢুকে ভিতর থেকে সদর দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছি, হঠাৎ আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে ফালা-ফালা করে দিয়ে দপ্‌দপিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলে উঠল একটি অতি দীর্ঘ বিদ্যুৎ-

শিখা! তার পরেই বজ্রের গর্জন! ইতিমধ্যে অন্ধকার কখন্ যে গোটা আকাশটা ভ'রে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে মেঘের পর মেঘের দল সেটা একেবারেই আমার নজরে আসেনি। বোধহয় বৃষ্টি পড়তে আর দেরি নেই।

বৈঠকখানায় প্রবেশ ক'রে টেবল্ ল্যাম্পটা উস্কে দিলুম। তারপর কৌতূহলী দৃষ্টি ফেললুম সেই ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত অতিথিটির দিকে।

অদ্ভুত, তার সবই অদ্ভুত! যেমন ঢ্যাঙা, তেমনি রোগা তার দেহ, খালি গা, খালি পা, কোমরে জড়ানো একখানা নতুন কাপড়! দেহের কোথাও যেন মাংস নেই, কেবল চাদর দিয়ে ঢাকা আছে যেন হাড়গুলো! কুচকুচে কালো রং। মাথায় বড় বড় চুল—বিশৃঙ্খল। মুখের দুই পাশ চুপ্‌সে বসে গিয়েছে। শুকনো ঠোঁট দুখানা ঠেলে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে বাইরে—যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ! আর কী বুভুক্ষু দৃষ্টি!

জানিনা, বুকের কাছটা কেন ছম্-ছম্ করে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাড়ীর বাইরে ঝড়ের চীৎকার।

থর্-থর্ করে কেঁপে উঠে আগন্তুক বললে, "উঃ। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। জানলা বন্ধ করে দিন—জান্‌লা বন্ধ করে দিন!"

জানালাগুলো বন্ধ ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, "মহাশয়ের কি কোনো ব্যামো-ট্যামো হয়েছিল?"

—"ব্যামো? হ্যাঁ, হয়েছিল বৈকি! শক্ত ব্যামো! সুবিধা পেয়ে শত্রুরা তাই আমাকে যমের বাড়ীতে পাঠাতে চেয়েছিল। তাই তো আমি তাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

"—শত্রু? শত্রু আবার কারা?"

—"জ্ঞাতিশত্রু, মশাই, জ্ঞাতিশত্রু। তাছাড়া আবার যমের বাড়ীতে পাঠাতে চাইবে কে?"

—"আপনার কথা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না। তারা কি আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল?"

—"বেশী কথা বলবার শক্তি আমার নেই। শুনছেন না, ঝড়ের

সঙ্গে আবার বৃষ্টি নামল। পৃথিবী এখনি ভাসবে, শীত আরো বাড়বে। আমি শীতার্ত, আমি শীতার্ত! উঃ, কি ক্ষিধে পেয়েছে—আমি ক্ষুধার্ত! কিছু খেতে দিন মশাই, আগে কিছু খেতে দিন!"

বললুম, "এত রাত্রে বাড়ীর সকলেরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। তবু চেষ্টা করে দেখছি, একটু অপেক্ষা করুন। কিন্তু বেশী কিছু দিতে পারব বলে মনে হয় না!"

—"যা পারেন তাই দিন, যা পারেন তাই দিন! ওঃ, শত্রুরা না খাইয়ে মারবে বলে কত দিন আমাকে কিছু খেতে দেয় নি—কত দিন আমি উপোস করে আছি!"

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে কোনরকমে সংগ্রহ করলুম কিছু ভাত, কিছু তরকারি, খানতিনেক রুটি, দুটি সন্দেশ ও চারটি নারিকেল নাড়ু। থালার উপরে তাই সাজিয়ে নিয়ে ফিরে এলুম বৈঠকখানায়।

দেখলুম একদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগন্তুক যেন কান পেতে কি শুনছে। চোখ দেখলে মনে হয়, তার দৃষ্টি যেন ঘরের নিরেট দেওয়াল ভেদ ক'রে চলে গিয়েছে বাইরে, কত দূরে!

বললুম, "আপনার খাবার এনেছি।"

সে যেন আমার কথা শুনতেই পেল না।

আচমকা ফিরে দাঁড়িয়ে ত্রস্তস্বরে সে বলে উঠল, "তারা আসছে, তারা আসছে!"

বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কারা আসছে?"

—"আমার শত্রুরা! আমি তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি! আমি চললুম!"

—"সে কি, আপনার খাবার এনেছি যে?"

—"না, না, আমি আর খাব না, আর আমি ক্ষুধার্ত নাই! শত্রুরা আবার আমাকে যমের বাড়ীতে পাঠাবার জন্যে ছুটে আসছে! আমি পালাই--আমি পালাই।" বলতে বলতে সে ছুটে ঘর থেকে

বেরিয়ে এল উদ্‌ভ্রান্তের মত। তারপরেই দুম্ ক'রে সদর দরজাটা খোলবার শব্দ হল!

হতভম্বের মত খাবারের থালা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, কে এই আশ্চর্য্য লোকটা? পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে আসেনি তো?

সদর দরজার কপাট দুখানা ঝোড়ো হাওয়ায় দুম্‌দাম্ করে একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলে যাচ্ছে। তখন পৃথিবীর আর সব শব্দ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ঝড়-বৃষ্টির দাপটে।

দরজাটা আবার বন্ধ করে দেবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি, আচম্বিতে দেখি ছয়-সাতজন লোক সবেগে দৌড়ে এসে হুড়মুড় ক'রে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ল।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তুলে ধরে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "কে?"

তাদের একজন বললে, "আমরা শ্মশান থেকে পালিয়ে আসছি!"

—"পালিয়ে আসছেন? কেন?"

—"এমন দুর্যোগে শ্মশানে কোন মানুষ তিষ্ঠোতে পারে? ছুটতে ছুটতে এই পর্যন্ত এসে আপনার বাড়ীর আলো দেখে এইখানেই ঢুকে পড়েছি।"

—"তাহ'লে আপনাদের শবদাহ শেষ হয়েছে?"

—"না মশাই, না। আমাদের কপাল আজ বড়ই মন্দ। শব শ্মশানে রেখে পাশের জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি, খাটের উপর থেকে মড়া অদৃশ্য হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, আজব কাণ্ড!"

আকস্মিক

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কথা হচ্ছিল আমাদের এক বন্ধু বিভূতিকে নিয়েই।

প্রায় দশ-বার দিন আমাদের আড্ডায় সে অনুপস্থিত। কোন খবর পর্যন্ত নেই। অথচ দলের মধ্যে সে-ই বেশী আড্ডাবাজ। রোজকার মত আমরা আমাদের ক্লাব-ঘরে এসে সেদিন সন্ধ্যায়ও জমায়েত হয়েছি এবং কখন যে আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে টেরও পাইনি। খেয়াল হলো রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ। এবারে বাড়ি ফেরা দরকার কিন্তু দরজা খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে করে সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজাটা তখুনি বন্ধ করে দিতে হলো।

ঝম্ ঝম্ করে তখনও সমানে বৃষ্টি ঝরছে এবং বৃষ্টি ছাটের ঘন কুয়াশায় চারদিক একাকার। সমস্ত গলিটা জলে ডুবে গিয়েছে, ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত জল থৈ থৈ করছে। সঙ্গে কারো একটা ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ কিছুই নেই অথচ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে স্নান করে যেতে হবে।

ফিরে এসে সকলে আবার জাঁকিয়ে বসলাম।

মহীন বললে,—বেরুনোই যখন যাবে না তখন ভূতের গল্প শোনা যাক। সরোজ, বল একটা জমাটি ভূতের গল্প।

আমাদের মধ্যে বন্ধু সরোজই সাহিত্যিক। শুধু সে সাহিত্যিকই নয়, চমৎকার গল্প বলবারও তার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু মহীনের প্রস্তাবে বাধা দিলে দিব্যেন্দু, বললে,—না, শচীনের নতুন কোন ম্যাজিক দেখা যাক।

আমি প্রস্তাবে এবারে সায় দিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল। শচীন শুরু কর।

আমাদের দলের মধ্যে শচীন এ্যামেচার ম্যাজিসিয়ান না হলেও ম্যাজিকে সত্যিই তার বাহাদুরি ছিল। আশ্চর্য রকমের ম্যাজিক এক এক সময় আমাদের দেখিয়ে সে কতদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে শচীন আপন মনে একটা সিগ্রেট টানছিল, আমার প্রস্তাবে সে বললে,-ম্যাজিক যে দেখাবো তা জিনিসপত্র কোথায়?

ঠাট্টা করে সরোজ বললে,--জিনিসপত্র না হলে ম্যাজিক দেখাতে পারবি না, তবে কিসের ছাই তোর ম্যাজিক!

---ঠিক আছে। শুধু হাতেই দেখাবো।

সকলে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

—ঘরের আলোটা নিবিয়ে দে—শচীন বললে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে একটা ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখ।

শচীনের কথামত তাই করা হলো। একটা মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলো ঘরের মধ্যে অদ্ভুত আলোছায়া সৃষ্টি করেছে। আলোর শিখার একটা ছায়া সেই আধো-আলো, আধো-আঁধারে দেওয়ালের গায়ে কাঁপছে। বাইরে সমানে পড়ছে বৃষ্টি। শচীন তার পূর্বের আসনেই বসা। আমরা চারজন ঘরের একদিকে গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছি।

--কিরে, কই শুরু কর তোর ম্যাজিক—সরোজ বললে।

—চুপ কর। কথা বলিস না!—ভারি গলায় বললে শচীন।

তারপর সবাই চুপচাপ। এক মিনিট, দু মিনিট করে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। সবাই অধৈর্য হয়ে উঠেছি!

এমন সময় সরোজ আবার প্রশ্ন করলে,—কি রে শচে, ঘুমালি নাকি বাবা?

--- চুপ---দরজাটা খুলে দে কে এসেছে দেখ—শচীন বললে।

সত্যিই! জলের ছপ ছপ্ একটা শব্দ সকলেই আমরা শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমে এগিয়ে এসে বন্ধ দরজার কাছেই থামলো। তারপর দরজার গায়ে শব্দ উঠলো—টুক্ টুক্।

—কে!

আবার শব্দ টুক্ টুক্। আমিই উঠে গিয়ে দরজাটা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে একবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই ক্ষণিক আলোর দীপ্তিতে দেখলাম কে যেন একজন ঠিক দোর গোড়াতেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে অস্পষ্ট একটা ছায়ার মত।

কে?

কিন্তু আগন্তুক আমার প্রশ্নের কোন সাড়া দিল না. খানিকটা জমাট কুয়াশার মতই যেন পাশ কাটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকতেই আমি দরজাটা যেমন বন্ধ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় ঘরের একটি মাত্র ক্যাণ্ডেলের আলোটি নির্বাপিত হলো। মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করলো। এবারে শচীন প্রশ্ন করলো— তুমি কে?

—আমি বিভূতি। চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত স্বাভাবিক গলায় সাড়া এলো।

—বিভূতি। কে বিভূতি!

—বিভূতি চক্রবর্তী।

হাত বাড়িয়ে দরজাটার ঠিক কাছেই দেয়ালে আলোর সুইচটা টিপলাম। খট করে একটা শব্দ হলো মাত্র, কিন্তু ঘরের আলো জ্বললো না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হলো, কে যেন ঠিক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। নিজের অজ্ঞাতেই দু-পা পিছিয়ে একেবারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। ভয়ে তখন আমার গলা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠেছে। হঠাৎ এমন সময় মনে পড়লো বিভূতি, বিভূতি চক্রবর্তী আমাদের বন্ধু। তবে । সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়টা কেটে গেল।

সোৎসাহে বললাম,—বিভূতি—তুই।—

—হ্যাঁ। সেই পূর্বের মত চাপা কণ্ঠস্বর। মনে হলো বড় যেন কষ্ট হচ্ছে তার কথা বলতে! আরো মনে পড়লো বিভূতি তো থাকে সেই ভবানীপুরে। প্রায় দশ-বার দিন আড্ডায় আমাদের আসে না

সে। সেই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে সেই ভবানীপুর থেকে ও এসেছে।

একটু বিস্ময়ই লাগে। আমি এবারে প্রশ্ন করলাম,—এই ঝড়-জলের মধ্যে এত রাত্রে তুই—ব্যাপার কি বিভূতি?

বিভূতি আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শচীনকে সম্বোধন করে বললে,—শচীন, আমাকে তুই ডাকছিলি কেন?

প্রশ্ন করলো এবার সরোজ,—এই জলের মধ্যে তুই এলি কি করে রে বিভু?

—জল!

—হাঁ বাইরে ত ভীষণ বৃষ্টি!

—তা হবে!

—তা হবে কি রে—চারিদিকে জল থৈ-থৈ করছে না? আগেই বুঝি বের হয়েছিলি?—বললে সরোজ।

—না ত! শচীন ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ত এলাম।

—ভিজে গেছিস ত একেবারে!

—না!

বলে কি বিভূতি, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি!

হঠাৎ আবার বিভূতি বললে,—আমি যাই ভাই!

—যাবি! কোথায় যাবি এই বৃষ্টির মধ্যে! মাথা খারাপ হলো নাকি তোর!

—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে রে, আমি আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারছি না। আমি চললাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা যেন খুলে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ করে জ্বলে উঠলো।

কিন্তু কোথায় বিভূতি! আমরা ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছি।

—বিভূতি! বিভূতি! আমি ছুটে দরজার বাইরে গেলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে। গলির মধ্যে জল অনেকটা কমে

এসেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কাউকে দেখতে পেলাম না। কেবল একটা জলের মধ্যে দিয়ে কারো হেঁটে যাবার ছপ্ ছপ্ শব্দ কানে ভেসে এলো।

পরের দিন ছটো সংবাদ আমরা জানতে পারলাম। একটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ; গত রাত্রে প্রচণ্ড তিন ঘণ্টাব্যাপী বৃষ্টির মধ্যে শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহ মিনিট কুড়ির জন্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাত্রি নয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত।

আর গত রাত্রে দিনকয়েক ভোগবার পর টাইফয়েডে আমাদের বন্ধু বিভূতি চক্রবর্তী রাত সাড়ে নয়টায় মারা গিয়াছে।

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা আজও অস্পষ্ট হয়ে আছে। তবে স্বীকার করতে পারিনি যেমন ব্যাপারটার মধ্যে শচীনের কোন ম্যাজিকের কেরামতি আছে, তেমনি এও স্বীকার করে নিতে মন চায়নি যে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন কিছু ভৌতিক ব্যাপার আছে। তবে যা ঘটেছিল তা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

টেলিফোনের কবলে

জরাসন্ধ

খুকুমণির একটি মাত্র দাঁত। তার চোটে সবাই অস্থির। সামনে যা কিছু পড়বে, ঐ ক্ষুদে দাঁতটুকু থেকে কারো নিস্তার নেই। ধূর্জটি ঘোষের ছেলে কমলের অবস্থাও ঠিক তার মতন। বাড়িতে টেলিফোন এসেছে। আর যায় কোথায়? চেনা, আধচেনা কিংবা মুখচেনা— টেলিফোনের নাগালের মধ্যে পড়েছ কি রক্ষা নেই। দিনে সতেরবার কমলের ক্রিং-ক্রিং কান ঝালাপালা না করে ছাড়বে না। যাদের বাড়িতে ফোন নেই, তাদেরও কি বাঁচবার পথ আছে? পাশের বাড়িতে কিংবা কাছাকাছি কোন দোকানে ক্রিং ক্রিং বেজে উঠল—

—কাকে চাই?

—বাদলকে একটু ডেকে দিতে পারেন?

—কে বাদল?

—আপনার পাড়ায় তেত্রিশ নম্বর বাড়িতে থাকে। বলবেন, কমল ডাকছে।

গরমের ছুটি চলছে। ইস্কুল বন্ধ। বেলা দশটায় বাবা বেরিয়ে যান কোর্টে। কমলও সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে তৈরি। তারপর সারা দুপুর বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে চলতে থাকে টেলিফোন। মা থাকেন ওপরে, এসব খবর রাখেন না। তা ছাড়া দুপুর রোদে টো-টো করে না ঘুরে ছেলে যে ঠাণ্ডা হয়ে বাড়িতে বসে আছে, এতেই তিনি খুশি। এদিকে ক্রমাগত 'রিং' খেয়ে নিজের লোক আর বন্ধু-বান্ধবরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে; আজকাল আর সাড়া দেয় না। পিসিমা এমন খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, কমলের মনে হল তার কানের পর্দাটাই বুঝি ফেটে

গেল। সেজমামা ধমকে দিয়েছিল—দাঁড়াও, তোমার বাবাকে বলে দিচ্ছি! কমল তাই বিরক্ত হয়ে চেনা মহল ছেড়ে দেওয়া স্থির করলো। এবার তার ফোনের পাল্লায় পড়ে গেল গোটা কলকাতা শহর। গাইড দেখে বেছে-বেছে যাকে খুশি ডাকে—কখনো কোন বড় দোকান বা কোন বড় অফিস, কিংবা কোন নামজাদা বড়লোক। কেউ ভদ্রভাবে সাড়া দেয়, দু-মিনিট হয়তো একটু গল্প করে; কেউ বা রেগে-মেগে ঘটাং করে রিসিভার রেখে দেয়। কারো গলাটা ভারী মিষ্টি, কেউ-বা আবার কথা বলে যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে। সে এক বিচিত্র জগৎ। সমস্ত দুপুর সে তন্ময় হয়ে থাকে, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে তারের জালে ঘেরা টেলিফোনের রহস্যলোকে।

—হ্যালো!

—আপনি কি ঝট্পটিলাল খট্মট্ওয়ালা?

—জী। আপ কাঁহাসে বল্তে হেঁ?

কমল গলাটা যদ্দুর সম্ভব গম্ভীর করে বলে, আমি প্রিন্স অব ডালটনগঞ্জ কথা বলছি!

—প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ! সেলাম হুজুর! বলিয়ে ক্যা হুকুম?

—দেখুন আপনাদের ভাল বেনারসী শাড়ি হবে তো?

—জরুর হবে। আপনি কোতো চান?

—বেশি নয়, খান-পঞ্চাশেক শাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারেন?

—হাঁ, হ্যাঁ, এখনি দিচ্ছি।

—না, না, এখনই চাই না। বিকেলের দিকে পাঠালেই চলবে।

—বহুৎ আচ্ছা। আপনার ঠিকানাটা যদি মেহেরবানি করে—

কমল ঠিকানাটা জানিয়ে দিল।

সেদিন বিকেলে ভাল খেলা ছিল মাঠে। কিন্তু খট্মট্ওয়ালার লোক তার বেনারসীর বোঝা নিয়ে কি রকম নাকালটা হয় দেখবার জন্যে খেলার লোভও ছাড়তে হল। চারটে বেজে পঞ্চান্ন। ধূর্জটিবাবু

অফিস থেকে ফিরেই আবার একদল মক্কেল নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন এমন সময় একখানা জমকালো মোটর এসে গেটের সামনে দাঁড়াল। নামলেন একজন মাড়োয়ারি ভদ্রলোক। সঙ্গে বিশাল এক কাপড়ের বাণ্ডিল। ঘরে ঢুকে রাম নাম জানিয়ে বললেন,—প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ আছেন কি?

ধূর্জটিবাবু বিরক্তির সুরে বললেন, প্রিন্স অব্ ডালটনগঞ্জ! সে আবার কে? আপনি বাড়ি ভুল করেছেন।

মাড়োয়ারি ভদ্রলোক বললেন, জী নেহী। নম্বর আমি সাথ সাথ নোট করে লিয়েছি। ভুল হামি করি নাই।

ধূর্জটিবাবু রুক্ষভাবে বললেন,—দেখুন বাজে তর্ক করবার সময় আমার নেই। এটা আমার বাড়ি। কোন প্রিন্স-টিন্স এখানে থাকে না। দয়া করে এবার আসুন নমস্কার।

—আপনি কোষ্টো করে একটু খবর লিয়ে দেখুন, সাহেব! প্রিন্স পঁচাশ জোড়া বেনারসীর অর্ডার দিলেন। ঘুরে গেলে বড্ড গোসা হোবেন। হামিও—

—আঃ, লোকটি তো বড্ড জ্বালাচ্ছে দেখছি! একশোবার বলছি এটা আমার বাড়ি! আমি ধূর্জটি ঘোষ, ওকালতি করে খাই। আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ প্রিন্স নেই।

মাড়োয়ারি বললেন—লেকিন্—

—আবার লেকিন্? আপনি যাবেন কি না জানতে চাই। দু-চারজন মক্কেলও বোঝাতে চেষ্টা করল—মাড়োয়ারিবাবুর নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। টেলিফোনে বাড়ির নম্বর এবং রাস্তার নাম হয়ত তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি। কিন্তু মাড়োয়ারি নাছোড়বান্দা। জোরের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, পঁচিশ বছর টেলিফোন নিয়েই তাঁর কারবার। ভুল তার হতেই পারে না। সময়ের দাম তাদেরও আছে। গাড়ি-ভাড়া আর মুটে খরচ না নিয়ে তিনি কিছুতেই নড়বেন না। তাঁর মনিব বড়বাজারের খট্‌মট্‌ওয়ালা। লাখ টাকার মালিক। এরকম উকিল দু-চার ডজন তাঁদের গদিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে—

ধূর্জটিবাবু রুখে এলেন আস্তিন গুটিয়ে। মাড়োয়ারিও পেছ-পা নয়। মক্কেলরা মাঝখানে পড়ে হাতাহাতিটা আর হতে দিলেন না। কোন রকমে ঠেলেঠুলে মাড়োয়ারিকে গাড়িতে তুলে রওনা করে দিলেন। সে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে গেল,—আচ্ছা, হাম্‌ভি দেখ্‌ লেঙ্গে।

রোখারুখি দেখে কমল প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশ মজাই লাগল। টেলিফোনটা তুলে মাত্র দুটি কথা। তার থেকে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড।

কমলদের বাড়ির ঠিক সামনে রাস্তার ওপারে থাকতেন এক জমিদার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি; তার সঙ্গে ফলের বাগান ভদ্রলোকের থাকবার মধ্যে তাঁর স্ত্রী আর এক ভাগনে।

হাড় কঞ্জুস। সারাদিন যমের মত বসে আছেন বাইরের ঘরে। পাড়ার কোন ছেলে গেটের ভিতর পা দিয়েছে কি দাঁত খিচিয়ে তাড়া করবেন। অথচ অমন গাছ-ভর্তি আম, ডাল-ভেঙ্গে পড়া লিচু আর জামরুল। এসব দেখে ঠিক থাকাই বা যায় কেমন করে? সেদিন একটা সুখবর পাওয়া গেল—বুড়োর নাকি অসুখ। দুপুরবেলা। পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেছে। বাসনওয়ালা কাঁসর বাজিয়ে চলে গেল। কমল আস্তে-আস্তে রাস্তা পার হয়ে গেটটা আলগোছে টপকে বাগানে ঢুকে পড়ল। মালিটারও দেখা নেই। বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। সামনেই একটা ছোট লিচু গাছ; সহজেই ওঠা যায়। টপাটপ কয়েকটা পাকা লিচু মুখে পুরে দিয়ে কমলের প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। দু-পকেট ভর্তি করে যেমনি নেমে পড়া—ব্যস। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জমিদার বুড়ো।

কে হে তুমি চাঁদ?

কমল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। জমিদারবাবু এগিয়ে এসে

চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা ধরে বললেন—ওঃ, ঘোষেদের ঐ বাঁদর-ছোঁড়াটা? বাবা অত বড় উকিল, তার ছেলে হল চোর। বিশ্বকর্মার পুত্র চামচিকে! কান ধর্—ধর্ কান, বলছি। কমল ডু-পকেট থেকে লিচুগুলো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগে-অপমানে তার দু-চোখ ফেটে বেরিয়ে এল কান্না।

পরদিন দুপুর বেলা টেলিফোন বেজে উঠল এক ডাক্তারের ক্লিনিকে।

—হ্যালো।

—ডাক্তার সান্যাল আছেন কি?

—কথা বলছি।

অমল অনুনয়ের সুরে বললে—দেখুন আমার মামার বড্ড অসুখ আপনাকে এখ্খুনি আসতে হবে, ডাক্তারবাবু।

—কী অসুখ?

—তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথার অসুখ বলে মনে হচ্ছে

—মাথার অসুখ!

—হ্যাঁ। যাকে দেখছেন, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাড়া করছেন। বাড়িতে আমি আর মামীমা ছাড়া কেউ নেই। আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি।

—আপনার নাম আর ঠিকানা?

কমল জমিদারবাবুর বাড়ির ঠিকানা আর তাঁর ভাগনের নাম বলে দিল।

জমিদার ঘনশ্যাম রায় তাঁর বৈঠকখানার পাশের ঘরে ঈজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ও-পাশের ঘরে তাঁর ভাগনে কি একটা করছিল। ডাক্তারের গাড়ি এসে বাড়ির সামনে থামল। ডক্টর সান্যাল নেমে এসে কড়া নাড়তেই দরজা খুলল ঘনশ্যামের ভাগনে।

—যতীনবাবু আছেন?

—আমারই নাম যতীন।

—ও, আপনিই বুঝি ফোন করেছিলেন? মামা কেমন আছেন?

—মামা!

—যাঁর মাথার অসুখ। তিনি আপনার মামা নন?

যতীন মুখচোরা লোক। হঠাৎ হতভম্ব হয়ে জবাব দিতে পারল না। কথাটা ঘনশ্যামের কানে গেল। তিনি এ-ঘরে এসে কড়া মেজাজে বললেন, কে আপনি?

—আমি ডাক্তার।

—এখানে কী দরকার?

ডাক্তার সান্যাল বুঝলেন, ইনিই তাঁর রোগী। মাথার গোলমাল কাজেই চটালে চলবে না। গলা মোলায়েম করে বললেন, আমি আপনার কাছেই এসেছি। এখন কেমন আছেন বলুন তো?

—থাক, অতটা দরদ না দেখালেও চলবে। যান এবার মানে মানে সরে পড়ুন।

ডাক্তার যতীনের দিকে চেয়ে বললেন—বাড়ীতে চাকর বাকর আছে তো? একটু ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম গর্জে উঠলেন—কী! ধরতে হবে আমাকে? কী মতলব তোমার?—যতীন, পুলিশে খবর দে! লোকটি মনে হচ্ছে ডাকাত!

ঠিক এমন সময় একখানা অ্যাম্বুলেন্স এসে গেটের সামনে দাঁড়াল একজন লোক বেরিয়ে এসে বললে—এটাই কি ২৫ নম্বর বাড়ি?

যতীন বললে, হ্যাঁ।

—যতীনবাবু বলে একজন লোক ফোন করেছিলেন এখানে নাকি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

ডাক্তার সান্যাল বললেন, অ্যাকসিডেন্ট নয়, একটা মেন্টাল কেস, মাথার ব্যাপার। যাক, এসে ভালই হয়েছে। হাসপাতালেই নেওয়া দরকার।

ঘনশ্যাম হঠাৎ ফেটে পড়লেন যতীনের উপর। গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে গর্জে উঠলেন, এ সব হচ্ছে কী, উল্লুক?

যতীন কেঁদে ফেলল। ডাক্তার সান্যাল অ্যাম্বুলেন্সওয়ালাদের

একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন মিলে ঘনশ্যামকে জাপটে ধরল এবং টেনে হিঁচড়ে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে শুইয়ে দিল। জমিদারবাবু কেঁদে, চেঁচিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে পাড়া মাথায় করে তুললেন। যতীনের মামীমা উপরের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। সোরগোল শুনে যখন বেরিয়ে এলেন, গাড়ি তখন স্টার্ট দিয়েছে।

ডাক্তার সান্যাল নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনি ভাববেন না মা। আপনার স্বামীর চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না।

অ্যাডভোকেট ধূর্জটি ঘোষ তাঁর কোর্ট আর মক্কেলের মধ্যেই ডুবে থাকতেন। একমাত্র ছেলের পড়াশুনোর খবরদারি করবার সময় ছিল না। বদভ্যাস ছিল কমলের এক কাকার। তিনি ছিলেন গোবর্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। একদিকে এক থালা রসগোল্লা আর একদিকে একখানা অঙ্কের প্রশ্নপত্র রেখে যদি তাকে বলা হত—কোনটা চাই, তিনি ঐ প্রশ্নটা তুলে নিতেন। এহেন কাকাকে কমল প্রাণপণে এড়িয়ে চলত।

গরমের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, কোথাও এবার বেড়াতে যাওয়া হল না। রবিবারের দুপুরটা বোটানিক্যালে ঘুরে এলে কেমন হয়, খেয়ে দেয়ে কমল এই সম্বন্ধে একটা প্ল্যান করছিল। হঠাৎ কাকা হাঁক দিলেন—কমল, অ্যালজেব্রা নিয়ে এস।... তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা চল্লিশেক শক্ত শক্ত ইকোয়েশন, হার্ডার ফ্যাক্টর্স আর আই-ডেনটিটিজ। কমল ঠিক করল, এর শোধ নিতে হবে।

এবারকার টেলিফোন ঝঙ্কার দিল থানায়।

—অফিসার-ইন-চার্জ কথা বলছি।

—সর্বনাশ হয়েছে বড়বাবু, শিগগির পুলিস পাঠান!

—কোথায়? কী ব্যাঙ্কের? কে আপনি?

—আমি গোবর্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। এখনি সাহায্য চাই—

সন্ধ্যাবেলা কাকা যখন ফিরলেন, তাঁর মুখ দেখে চমকে উঠল সবাই। দরোয়ান বললে, কে কোত্থেকে উড়ো খবর দিলে ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। থানার বড় দারোগা এসে যাচ্ছেতাই করে বকে গেল ম্যানেজারবাবুকে। উনি কত করে বললেন আমি কিছু জানি না—কে শোনে! আবার জানিয়ে গেল—মামলা করবে পুলিসকে মিথ্যে হয়রান করবার জন্যে।

কমলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ দারোগার উপর। আচ্ছা, সেও মজা দেখাতে জানে! একটা রাত আর কয়েক ঘন্টার মামলা! তারপর বাবাজী টের পাবেন কত ধানে কত চাল।

পরদিন বেলা এগারোটা।

—নাম্বার প্লিজ!

—হ্যালো!

—বড়বাবু আছেন?

—তিনি তো কোর্টে গেছেন। আপনার কী দরকার?

—ওঁকে এখখুনি খবর দিন যে ওঁর ছেলেকে কুকুরে কামড়েছে ভয়ানক পাগলা কুকুর।

ফোনের ওদিকটা আঁৎকে উঠল- কুকুরে কামড়েছে! কী সর্বনাশ! আপনি কে বলুন তো?

—আমি ওঁদের পাড়ার-লোক।

ফোন রেখে কমলের মনে হল গলা যেন তার চেনা-চেনা ঘন্টাখানেক পরে একখানা ট্যাক্সি এসে হাজির। ধূর্জটিবাবুর মুহুরি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাড়ি ঢুকল। পেছনে ওদের পুরানো ডাক্তার গজপতি সেন। কমল বাইরের ঘরেই ছিল। ডাক্তার সেন এগিয়ে এসে তার হাতের নাড়ি পরীক্ষা করতে করতে বললেন, কতক্ষণ আগে কামড়াল? কুকুরটা ক্ষ্যাপা না পোষা, লক্ষ্য করেছ?

কমল অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

ডাক্তার তার পিঠ চাপড়ে বললেন, বোকা ছেলে! পাগলা কুকুরের কামড় লুকাতে আছে কখনো? নিজে-নিজেই বুঝি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে?

কমল বলল, কী বলছেন আপনি? এ তো কিছুর কামড় নয়! খেলার মাঠে পড়ে গিয়ে কাঁটা-তারে কেটে গেছে খানিকটা।

ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন, বেশ, তাই হল। এবার ওঠ দিকিনি। একটা জামা পরে নিয়ে চল। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

মুহুরির সঙ্গে মা নেমে এলেন হন্তদন্ত হয়ে কী সর্বনেশে ছেলে মাগো! পাগলা কুকুরের কামড়! কাউকে বলা নেই কওয়া নেই, দিব্যি চুপচাপ বসে আছে—ছুটো ইনজেকশন দেবে এই ভয়ে!

মুহুরি বলল, তাই একবার দেখুন দিকি মা! ভাগ্যিস একটি পাড়ার ছেলে বুদ্ধি করে খবরটা দিলে তাই! বাবু সবে কোর্টে গিয়ে মামলা ধরেছেন। জানাই কী করে? চুপ করেও তো থাকা যায় না। শেষটায় খবর দিতে হল। শুনে কোর্ট শুদ্ধ লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবু বললেন, ট্যাক্সি নিয়ে ছোট, নিবারণ ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়ে দেখ ছেলেটা বেঁচে আছে কি না?

মা কেঁদে ফেললেন, কী হবে ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার সেন ভরসা দিলেন, ভয়ের কিছু নেই। এখখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

কমল বুঝল, প্রতিবাদ টিঁকবে না। নিজেকে ছেড়ে দিল ভাগ্যের হাতে। ভাগ্য বৈকি! নইলে সে চাইল—ওয়ান ও ফাইভ সেভেন, আর এক্সচেঞ্জ-ডেভিলটা দিয়ে বসল—ওয়ান ও নাইন সেভেন! একেবারে তার বাবার নম্বর! পাঁচের বদলে নয়—তার ফল যে এতখানি মারাত্মক হবে কে ভাবতে পেরেছিল?

পাস্তুর ইনস্টিটিউট। একটা উঁচু মতন বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিল তাকে। কাঁটা-তারের খোঁচাটাকে ছুরি দিয়ে কেটে বাড়িয়ে দিল কচ্ কচ্ করে—যেন শশা কাটছে। তার মধ্যে ঢেলে দিল কষ্টিক না কি-এক পৈশাচিক ওষুধ। কমলের চোখে ছুনিয়ার সব আলো

নিভে গেল দপ্ করে, বুক চিরে বেরিয়ে এল এমন এক বীভৎস চীৎকার, যার তুলনা মেলে শ্মশানের প্রেতগুলো যখন চেঁচায়। তারপর আর একটা জল্লাদ এসে পেটের উপর ফুটিয়ে দিল প্যাট্ প্যাট্ করে দুটো ইনজেকশন; হেসে বলল, ভয় কী খোকা? এই তো সবে শুরু। এই রকম স্যাটাশটা দিতে হবে চৌদ্দ দিন ধরে।

কমন শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একবার।

আখড়াইয়ের দীঘি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর পর পর অজন্মার উপর সে বৎসর নিদারুণ অনাবৃষ্টিতে দেশটা যেন জ্বলিয়া গেল। বৈশাখের প্রারম্ভেই অন্নাভাবে দেশময় হাহাকার উঠিল। রাজ্য সরকার পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সত্যই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না তদন্তের জন্য, রাজকর্মচারী মহলে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল।

এই তদন্তে কান্দী সাব্-ডিভিশনের কয়টা থানার ভার লইয়া ঘুরিতেছিলেন রজতবাবু ডি, এস, পি, সুরেশবাবু ডেপুটি আর রমেন্দ্রবাবু কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর। অতীত কালের সুপ্রশস্ত বাদশাহী সড়কটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গো-পথের মতো মানুষের অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ঠিকাদার মাটির ঢেলা বিছাইয়া পথটিকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। কোনরূপে তিন জনে এক পাশের পায়ে-চলা পথরেখার উপর দিয়া বাইসিক্ল ঠেলিয়া চলিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণবেলা। দগ্ধ আকাশখানা ধূলাচ্ছন্ন ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কণামাত্র মেঘের রেশ নাই। হু-হু করিয়া গরম বাতাস পৃথিবীর বুকের রস পর্যন্ত শোষণ করিয়া লইতেছিল। একখানা গ্রাম পার হইয়া সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আসিয়া পড়িল। ও-প্রান্তের গ্রামের চিহ্ন এ-প্রান্ত হইতে দৃষ্টিতে ধরা দেয় না। দক্ষিণে বামে শস্যহীন মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। গ্রামের চিহ্ন বহু দূরে দিগ্বলয়ে কালির ছাপের মতো বোধ হইতেছিল।

রজতবাবু চলিতেছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, নামছি আমি। আপনারা ঘাড়ের উপর এসে পড়বেন না যেন! তিন জনেই বাইসিক্ল হইতে নামিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা কোন প্রশ্ন করিবার পূর্বেই

তিনি বলিলেন, কই মশাই, সামনে গ্রামের চিহ্ন দেখা যায় না। এদিকে যে দিবা অবসান প্রায়!

রমেন্দ্রবাবু কোমরে ঝুলানো বাইনোকুলারটা চোখের উপর ধরিয়া কহিলেন, দেখা যাচ্ছে গ্রাম, কিন্তু অনেক দূরে। অন্ততঃ পাঁচ-ছ মাইল হবে।

রজতবাবু রিস্ট-ওয়াচটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, পৌনে ছটা। এখনও আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার দিনের আলো পাওয়া যাবে। কিন্তু এদিকে যে বুক মরুভূমি হয়ে উঠল মশাই। আমার ওয়াটার ব্যাগে তো একবিন্দু জল নেই আর আপনাদের অবস্থা কি?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, আমারও তাই। সুরেশবাবু আপনার অবস্থা কি? আপনি যে কথাও বলছেন না। দৃষ্টিটাও বেশ বাস্তব জগতে আবদ্ধ নেই যেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

সুরেশবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন সত্যিই বর্তমান জগতে ঠিক মনটা নিবদ্ধ ছিল না। অনেক দূরে অতীতের কথা ভাবছিলাম।

রজতবাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, অতীত যখন তখন ইন্টারেস্টিং নিশ্চয়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আর ভাবতে হবে না। উঠে পড়ুন গাড়িতে। গাড়িতে চলতে চলতেই আপনি গল্প বলতে শুরু করুন আমরা শুনে যাই। কিন্তু এই চার-পাঁচ মাইল পথ কভার করবার মত গল্পের খোরাক হওয়া চাই মশাই।

সুরেশবাবু আপনার জলাধারটি খুলিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার জল এখনও আছে। জল পান করে একটু সুস্থ হন আগে।

জলপানান্তে সুরেশবাবুকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়া রজতবাবু বলিলেন, আপনি কথক। আপনাকে আগে যেতে হবে।

সকলে গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, আপনাদের জলের চিন্তার কথা শুনেই কথাটা আমার মনে পড়ল।

পিছন হইতে রমেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন, দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে গল্প চলবে কি রকম। বেশ, এইবার কি বলছিলেন বলুন—একটু উচ্চকণ্ঠে কিন্তু।

সুরেশবাবু বলিলেন, যে রাস্তাটায় চলেছি আমরা, এ রাস্তাটার নাম জানেন? এইটেই অতীতের বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক। এ রাস্তায় কোন পথিক কোনদিন জলের জন্য চিন্তা করেনি। ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ, এ পথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। দীঘিগুলো এখনও আছে—

বাধা দিয়ে রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, ডাক-অন্তর মসজিদটা কি ব্যাপার?

ডাক-অন্তর মসজিদের অর্থ হচ্ছে—এক মসজিদের আজানের শব্দ যতদূর পর্যন্ত যাবে, ততদূর বাদ দিয়ে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল। এক মসজিদের আজান-ধ্বনি অপর এক মসজিদ থেকে শোনা যেত। ভাবুন একদিন দেশ-দেশান্তরব্যাপী সুদীর্ঘ এই পথখানির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একসঙ্গে আজান ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠত। ওই, ওই দেখুন, পাশের ওই যে ইটের স্তূপ—ওটি একটা মসজিদ ছিল। আর প্রতি ক্রোশে একটি দীঘি আছে। তাই বলছিলাম, এ রাস্তায় কেউ কখনও জলের ভাবনা ভাবেনি।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, বাদশাহী সড়ক যখন, তখন কোন বাদশাহের কীর্তি নিশ্চয়। কিন্তু কোন বাদশাহের কীর্তি মশাই?

ঠিক বুঝতে পারা যায় না, ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন। তবে এ বিষয়ে সুন্দর একটি কিংবদন্তী এ দেশে প্রচলিত আছে। শোনা যায় কোন বাদশাহ বা নবাব নাকি দিগ্বিজয়ে গিয়ে ফেরবার মুখে এক সিদ্ধ ফকিরের দর্শন পান। সেই ফকির তাঁর অদৃষ্ট গণনা করে বলেন, রাজধানী পৌঁছেই তুমি মারা যাবে।

বাদশাহ ফকিরকে ধরলেন—এর প্রতিকার ক'রে দিতে হবে।

ফকির হেসে বললেন, মৃত্যুর গতি রোধ করা কি আমার

ক্ষমতা ? বাদশাও ছাড়েন না। তখন ফকির বললেন,তুমি এক কাজ কর। তুমি এখান থেকে এক রাজপথ তৈরি করতে করতে যাও তোমার রাজধানী পর্যন্ত। তার পাশে পাশে ক্রোশ-অন্তর দীঘি আর ডাক-অন্তর মসজিদ তৈরি কর।

সুরেশবাবু নীরব রইলেন। রজতবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, তারপর মশাই, তারপর ?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, তারপর বুঝুন না কি হ'ল। আজকাল গল্প সাজেস্টিভ হওয়াই ভালো। বাদশাহ রাজধানী পৌঁছেই মারা গেলেন। কিন্তু কত দিন তিনি বাঁচলেন অনুমান করুন। এই পথ, এই সব দীঘি, এতদিন মসজিদ তৈরি করতে যতদিন লাগে, ততদিন তিনি বেঁচেছিলেন।

রজতবাবু বলিলেন, হাম্‌বাগ, বাদশাহটি একটি ইডিয়ট ছিলেন বলতে হবে। তিনি তো পথটা শেষ না করলেই পারতেন। আজও পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন

রমেন্দ্রবাবু গাড়ি হইতে নামিবার উদ্যোগ করিয়া কহিলেন, দাঁড়ান মশাই, এই পথের ধুলো আমি খানিকটা নিয়ে যাব, আর মসজিদের একখানা ইঁট।

সুরেশবাবু কহিলেন, আর একটা কথা শুনে, তারপর। পথ তো ফুরিয়ে যায়নি আপনার।

রজতবাবু তাগাদা দিলেন, সেটা আবার কি ?

এ দেশে একটা প্রবচন আছে। সেটার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকা সম্ভব। পুলিশ রিপোর্টে সেটা আছে।

রমেন্দ্রবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, চুলোয় যাক মশাই পুলিশ রিপোর্ট। কথাটা বলুন তো আপনি।

তাড়া দেবেন না মশাই গল্পের রস নষ্ট হবে। কথাটা হচ্ছে 'আখ্‌ড়াইয়ের দীঘির মাটি, বাহাত্তরপুরের লাঠি, কুলীর ঘাঁটি।' এই তিনের যোগাযোগে এখানে শত শত নরহত্যা হয়ে গেছে। রাত্রে এ পথে পথিক চলত না ভয়ে। বাহাত্তরপুরে বিখ্যাত লাঠিয়ালের

বাস। তারা রাত্রে এই পথের উপর কুলীর ঘাঁটিতে নরহত্যা করত। আর সেই সব মৃতদেহ গোপনে সমাহিত করত আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভে।

রজতবাবু বলিয়া উঠিলেন, ও, তাই নাকি! এই সেই জায়গা?

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন, তার কাছাকাছি এসেছি আমরা।

রজতবাবু কহিলেন, এখনও পূজোর আগে এখানে চৌকিদার রাখবার ব্যবস্থা আছে?

আর তার দরকার নেই বোধ হয়। এখন এরা শাসন মেনে নিয়েছে।

রমেন্দ্রবাবুর গাড়িখানি এই সময় একটা গর্তে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। রমেন্দ্রবাবু লাফ দিয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিলেন। সকলেই গাড়ি হইতে নামিয়া আগাইয়া আসিলেন। গাড়িখানা তুলিয়া রমেন্দ্রবাবু বলিলেন, যন্ত্র বিকল। এখন ইনিই আমার ঘাড়ে চেপে যাবার মতলব করেছেন। ধাক্কায় একখানা চাকা বেঁকে টাল খেয়ে গেছে। আমাদের হাতের মেরামতের বাইরে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। রজতবাবু অস্পষ্ট সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ যে মহাবিপদ হ'ল সুরেশবাবু! কি করা যায়?

হাসিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, পথপার্শ্বে বিশ্রাম। মালপত্র নিয়ে পেছনের গো-যান না এলে তো উপায় বিশেষ দেখছি নে।

আপনাকে বিপদের হেতু ভাবিয়া রমেন্দ্রবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তখনও গাড়িখানা লইয়া মেরামতের চেষ্টা করিতেছিলেন। রজতবাবু কহিলেন, ঘাড়ে তুলুন মশাই বাহনকে। তবু একটা বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান দেখে নেওয়া যাক।

বাইসিক্লে ঝুলানো ব্যাগ হইতে টর্চটা বাহির করিয়া সুরেশবাবু সেটার চাবি টিপিলেন। তীব্র আলোকরেখায় সম্মুখের প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। অদূরে একটা মাটির উঁচু স্তূপ দেখিয়া

সুরেশবাবু কহিলেন, এই যে সম্মুখেই বোধহয় আখড়াইয়ের দীঘি। চলুন ওরই বাঁধাঘাটে বসা যাবে।

রজতবাবু বলিলেন হ্যাঁ, অতীত যুগের কত শত হতভাগা পথিকের প্রেতাত্মার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথাবার্তা অতি উত্তমই হবে।

এতক্ষণে হাসিয়া রমেন্দ্রবাবু কথা কহিলেন, আর বাহাদুরপুরের দু-একখানা লাঠির সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, সে উদ্যমের পরে অযোগ্য মধ্যম হবে না। কি বলেন ?

কোমরে বাঁধা পিস্তলটায় হাত দিয়া রজতবাবু কহিলেন, তাতে রাজী আছি।

প্রকাণ্ড দীঘিটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া আছে। শুধু আকাশের তারার প্রতিবিম্বে জলতলটুকু অনুভব করা যাইতেছিল। চারি পাড় বেড়িয়া বন্য লতাজালে আচ্ছন্ন বড় বড় গাছগুলিকে, বিকট দৈত্যের মতো মনে হইতেছিল। চারিদিক অন্ধকারে থমথম করিতেছে। দীঘিটার দীর্ঘ দিকের মধ্যস্থলে সে আমলের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট। প্রথমেই সুপ্রশস্ত চত্বর। তাহারই কোল হইতে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে জলগর্ভে। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে দুইটি রানা। একদিকের রানা ভাঙিয়া পাশেরই একটা সুগভীর খাতের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে।

ঘাটের চত্বরটির মধ্যস্থলে তিনজন আশ্রয় লইয়াছিলেন। এক পাশে সাইকেল তিনখানা পড়িয়া আছে। ছোট একখানা শতরঞ্চি রমেন্দ্রবাবুর গাড়ির পিছনে গুটানো ছিল। সেইখানা পাতিয়া রমেন্দ্রবাবু বসিয়াছিলেন। পাশেই সুরেশবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়া আছেন। রজতবাবু শুধু চত্বরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন, সাবধানে পায়চারী করবেন রজতবাবু। অন্যমনস্কে খাদের ভেতরে গিয়ে পড়বেন না যেন। দেখেছেন তো খাদটা ?

হাতের টর্চটা টিপিয়া রজতবাবু বলিলেন, দেখেছি।

আলোক-ধারাটা সেই গভীর গর্তে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। সুগভীর খাদটার গর্ভদেশটা আলোকপাতে যেন হিংস্র হাসি হাসিয়া উঠিল। রজতবাবু কহিলেন, উঃ, এর মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই। ভাঙ্গা রানাটার ইঁটের ওপর পড়লে হাড় চুর হয়ে যাবে।

তিনি এদিকে সরিয়া আসিয়া নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিলেন। আলোক নিভবার পর অন্ধকারটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। ওদিকে পশ্চিম দিকপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দীপ্তি চকিত হইয়া উঠিতেছিল। সুরেশবাবু নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, কে কি ভাবছেন বলুন তো?

রমেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ওদিকে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে বোধ হচ্ছে! কি বলুন তো?

সঙ্গে সঙ্গে দুইটা টর্চের শিখা দীঘির বুক উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

রজতবাবু কহিলেন, কই?

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, ওপারে ঠিক জলের ধারে। লম্বা মতো—মানুষের মতো কি ঘুরে বেড়াচ্ছিল বোধ হ'ল।

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, দীঘির গর্ভের কোন অশান্ত প্রেতাত্মা হয়তো। কিংবা বাহাদুরপুরের লাঠিয়াল কেউ।

রজতবাবু কহিলেন, সে হলে তো মন্দ হয় না। একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়, সময় কাটে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু হ'লেই যে বিপদ। যাদের সঙ্গে কথা চলে না মশাই—সাপ বা জানোয়ার। ওটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাঁ হাতের টর্চটা জ্বলিয়া উঠিল। ডান হাত তখন পিস্তলের ঘোড়ায়। সচকিত আলোয় দেখা গেল, সেটা একগাছা ছিন্ন দড়ি।

সুরেশবাবু বলিলেন, গুড্ লাক্। রজ্জুতে সর্পভ্রমে লজ্জা আছে, বিপদ নেই। কিন্তু সর্পে রজ্জুভ্রম প্রাণান্তকর।

সকলেই হাসিলেন, কিন্তু সে হাসি মৃত্যুমন্থর। আনন্দ যেন জমাট বাঁধিতেছিল না।

আবার সকলেই নীরব।

অকস্মাৎ দীঘির ওদিকের কোণে জল আলোড়িত হইয়া উঠিল। শব্দে মনে হয়, কেহ যেন জল ভাঙিয়া চলিয়াছে। টর্চের আলো অতদূর পর্যন্ত যায় না। আলোকধারার প্রান্তমুখে অন্ধকার ঘন বড় হইয়া উঠে, কিছু দেখা গেল না।

রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, এখনও বলবেন আমার ভ্রম?

সুরেশবাবু কথার উত্তর দিলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে শব্দটা লক্ষ করিতেছিলেন। শব্দটা নীরব হইয়া গেল।

সুরেশবাবু আরও কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ভ্রমই বোধ হয় জলচর কোন জীবজন্তু হবে।

গরম বাতাসের প্রবাহটা ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া চারিদিকে একটা অশান্তিকর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশবাবু আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না শুধু রমেন্দ্রবাবুকে দোষ দিই কেন—আমরা সকলেই ভয় পেয়েছি। সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত ভুলে গেছি মশাই। নিন, সিগারেট খাওয়া যাক।

রজতবাবু বলিলেন, না মশাই, একেই আমি ওতে অভ্যস্ত নই, তার ওপর খালি পেটে শুকনো গলায় সহ্য হবে না। থাক্।

আসুন রমেনবাবু, আমরা দুজনেই— ও কি?

মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বরে তিন জনেই চকিত হইয়া উঠিলেন।

কে যেন আত্মগতভাবেই মৃদুস্বরে বলিতেছিল, তারা, তারাচরণ এইখানেই তো ছিল?

রজতবাবুর হাতের টর্চটা প্রদীপ্ত রশ্মিরেখায় জ্বলিয়া উঠিল।

রমেন্দ্রবাবু ত্রস্তস্বরে বলিলেন, এদিকে, এদিকে ভাঙা রানাটার পায়ে জলের ধারে। ওই—ওই। কিন্তু দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে কি? চোখ কি? ওই—ওই—

দীর্ঘ রশ্মিধারা ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর টর্চটাও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জলের ধারে দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি দাঁড়াইয়া ছিল।

আলোকচ্ছটার আঘাতে চকিত হইয়া সে রশ্মির উৎস-লক্ষ্যে মুখ ফিরাইলে রমেন্দ্রবাবু অস্ফুট চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সুরেশবাবুর হাতের টর্চটা নিভিয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত, অতি ভীতিপ্রদ সে মূর্তি!

দীর্ঘ বিবর্ণ চুল, দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফে সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন। অস্বাভাবিক দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ দেহখানা কর্দমলিপ্ত। কোটরগত জ্বলন্ত চোখ দুইটিতে আলো পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল। সে মূর্তি ধরণীর সজীবতার সর্বমাধুর্যবর্জিত, মাটির জগতের বলিয়া বোধ হয় না।

রজতবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তবুও তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? উত্তর দাও। কে তুমি?

নিথর নিস্তব্ধ মূর্তির মুখের পেশীগুলি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে অধররেখা ভিন্ন হইয়া গেল। সে ভঙ্গিমা যেমন হিংস্র, তেমনই ভয়ংকর।

রজতবাবু আকাশ লক্ষ্যে পিস্তলটার ঘোড়া টিপলেন। সুগভীর গর্জনে নিবিড় অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। বৃক্ষনীড়াশ্রয়ী পাখির দল কলরব করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত আর একটা গর্জনে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। একটা বিকট হিংস্র গর্জন করিয়া সে বিকট মূর্তি লাফ দিয়া ছুটিয়া আসিল। সে মূর্তি তখন জানোয়ারের চেয়ে হিংস্র—উন্মত্ত। রজতবাবুর বাঁ হাতের টর্চটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। ডান হাতে পিস্তলটা কাঁপিতেছিল। অন্ধকারের মধ্যে গুরুভার কিছু পতনের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আহত পশুর মতো একটা আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, সুরেশবাবু শিগগির টর্চটা জ্বালুন। আমারটা কোথায় পড়ে গেছে।

সুরেশবাবুর হাতের আলোটা জ্বলিয়া উঠিল।

রজতবাবু কহিলেন, এখানে আসুন—খাদের মধ্যে।

খাদের মধ্যে আলোকপাত করিতেই রজতবাবু বলিলেন, মানুষই। কিন্তু ম'রে গেছে বোধ হয়। ঘাড় নিচু ক'রে পড়েছে। ঘাড় ভেঙে গেছে।

সুরেশবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের মধ্যে হতভাগ্যের মাথাটা অর্ধ-প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রণার আক্ষেপে উর্দ্ধমুখে সমগ্র দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উপর হইতে রমেন্দ্রবাবু সভয়ে কাহাকে প্রশ্ন করিলেন, কে? ও কি? কিসের শব্দ?

ক্ষণিক মনোযোগ সহকারে শুনিয়া সুরেশবাবু কহিলেন, গাড়ি—গরুর গাড়ির শব্দ!

গন্তব্য থানায় পৌঁছিতে বাজিয়া গেল বারোটা।

তিন বন্ধুতেই নীরব! একটা বিষন্ন আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন চলাফেরা করিতেছিলেন। শবদেহটা গাড়ীতে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে।

সেটা নামানো হইলে রজতবাবু সাব-ইন্সপেক্টরকে বলিলেন, লোকটাকে এখানকার কেউ চিনতে পারে কি না দেখুন তো!

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। রজতবাবু প্রশ্ন করিলেন, চেনেন আপনি?

না। কিন্তু এ কি মানুষ?

জমাদার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, আমি চিনি স্যার। এ একজন দ্বীপান্তরের আসামী। আজ দিন দশেক খালাস হয়ে বাড়ি এসেছে। সেদিন এসেছিল থানায় হাজিরা দিতে! বাহাদুরপুরের লোক, নাম কালী বাগদী।

বেশ। তা হ'লে রিপোর্ট লেখ। একটা গামছায় বাঁধা কোমরে ওর কি কতকগুলো ছিল—দেখ তো সেগুলো কি?

অনুসন্ধানে বাহির হইল একখানা কাপড়। ছোট ঘটি একটা, কয়খানি কাগজ। কাগজগুলি একটা মোকদ্দমার নথি ও রায়। নথিগুলিতে বহরমপুর জেলের ছাপ মারা—জেল-গেটে জমা ছিল।

সঙ্গে একখানি চিঠি. হাইকোর্টের কোন উকিলের লেখা—এরূপভাবে সংবাদদেশের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আপীল করা অস্বাভাবিক ও আমাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিজনক। সেইজন্য ফেরত পাঠানো হইল।

রজতবাবু নথিটা পড়িয়া গেলেন—

দায়রা আদালতের নথি। ১৩০৮ সালের ৫নং খুনী মামলার ইতিহাস। সম্রাট বাদী. আসামী—কালীচরণ বাগদী।

অভিযোগ আসামী তাহার পুত্র তারাচরণ বাগদীকে হত্যা করিয়াছে। সাক্ষী তিন জন।

প্রথম সাক্ষী মোবারক মোল্লা! এই ব্যক্তি বাহাদুরপুরের নাগকারদার, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিকে সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করলেন. কালীচরণ বাগদীকে আপনি চেনেন?

উত্তর—হাঁ। এই আসামী সেই লোক।

কি প্রকৃতির লোক কালীচরণ?

ওস্তাদ লাঠিয়াল।

আপনার সঙ্গে কি কালীচরণের কোনও ঝগড়া আছে?

না। সে আমার ওস্তাদ। আমি তার কাছে লাঠিখেলা শিখেছি

তারাচরণ বাগদীকে আপনি জানতেন?

হাঁ। ওস্তাদ কালীচরণেরই ছেলে সে।

আচ্ছা, এটা কি ঠিক যে কালীচরণ তারাচরণকে ভালো চোখে দেখতে পারত না?

না। তবে ছেলেবেলায় তারাচরণ খুব রুগ্ন দুর্বল ছিল বলে ওস্তাদের ছেলেকে মন উঠত না। বলত, বেটাছেলে যদি বেটাছেলের মতো না নয়, তবে সে ছেলে নিয়ে করব কি?

তারপর, বরাবরই তো সেই রকম ভাব ছিল?

না। তারাচরণ বারো-তেরো বছর বয়স থেকে সেরে উঠে জোয়ান হতে আরম্ভ হ'ল ওস্তাদের চোখের মণি হয়ে উঠেছিল সে।

কালীচরণ কি তারাচরণকে আখড়ায় মারত না?

হাঁ। ভুল করলে ওস্তাদের হাতে কারও রেহাই ছিল না, নিজের ছেলে ব'লে দাবির ওপর—

থাক্ ও কথা। আচ্ছা আপনি কি জানেন, কুলীর ঘাঁটিতে রাতে পথিক খুন হয়?

জানি। শুনেছি বরাবর থেকে। বোধ হয় একশো বছর ধরে এ কাণ্ড ঘটে আসছে।

কারা এসব করে জানেন?

না।

শোনেন নি?

বহুজনের নাম শুনেছি।

আপনাদের গ্রামের বাগদীদের নাম—এই কালীচরণ, তার পূর্বপুরুষ, এদের নাম শুনেছেন কি?

শুনেছি।

সরকারপক্ষের উকিল সাক্ষীকে জেরা করিতে ইচ্ছা করেন না। দ্বিতীয় সাক্ষী এলোকেশী বাগদিনী। মৃত তারাচরণ বাগদীর স্ত্রী। বয়স আঠারো বৎসর।

প্রশ্ন—এই আসামী কালীচরণ তোমার শ্বশুর?

হাঁ।

আচ্ছা বাপু, তোমার স্বামীর সঙ্গে কি তোমার শ্বশুরের ঝগড়া ছিল?

না।

কখনও ঝগড়া হ'ত না?

ঝগড়া হ'ত বইকি। কতদিন টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু তাকে ঝগড়া বলে না।

কিসের টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া?

খুনের, ডাকাতির। আমার শ্বশুর, আমার স্বামী মানুষ মারত। ডাকাতিও করত।

কেমন ক'রে জানলে তুমি?

বাড়ীতে শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, আমার স্বামীর কাছে শুনেছি, এদের বাপ-বেটার কথাবার্তায় বুঝেছি। আর কতদিন রক্তমাখা টাকা গয়না জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছি।

তোমার স্বামী তারাচরণকে কে খুন করেছে জান?

জানি। আমার শ্বশুর খুন করেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি

বিচারক প্রশ্ন করেন, তুমি নিজের চোখে খুন করা দেখেছ?

হ্যাঁ হুজুর, সমস্তই দেখেছি।

বিচারক আদেশ করেন, কি দেখেছ তুমি, আগাগোড়া বল দেখি?

সরকার পক্ষের উকিলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। সাক্ষীর উক্তি—

হুজুর, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই আমি বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। শ্রাবণের সাতাশে আমার ছোট বোনের বিয়ে ছিল। আমার স্বামী পঁচিশে তারিখে সেই বিয়ের নিমন্ত্রণে এখানে আমার বাপের বাড়িতে আসে। আরও অনেক কুটুম্বজন এসেছিল! জাত-বাগদী আমরা হুজুর, সকলেই আমাদের লাঠিয়াল। আর ছোট জাতের আমোদে-আহ্লাদে নেশাই হ'ল হুজুর, প্রধান জিনিস। বড় বড় জোয়ান সব দিবারাত্র নেশা করেছে আর ঘাঁটি খেলেছে।

বিচারক প্রশ্ন করেন, ঘাঁটি-খেলা কি?

হুজুর, ডাকাতি করতে গিয়ে যেমনভাবে লাঠি খেলে, গেরস্থর ঘর চড়াও ক'রে বাইরের লোককে আটকে রাখে, সেই খেল্লার নাম ঘাঁটি-খেলা। সেই খেলা খেলতে আমার স্বামীর সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হয়। তিন-তিন বার আমার স্বামী আমার দাদার ঘাঁটি ভেঙে দিয়ে বলেছিল—এ ছেলেখেলা ভালো লাগে না বাপু, যদি মরদ তোদের কেউ থাকে, তবে নিয়ে আয়। সেই নিয়ে ঝগড়া, মনের রাগে দাদা রাত্রে খাবার সময় আমার স্বামীর কুলের খোঁটা তুলে অপমান করে। স্বামী আমার তখনই উঠে পড়ে সেখান থেকে চ'লে আসে। আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে নি, হুজুর—তা

হ'লে তাকে আমি সেই অন্ধকার বাদল রাতে বেরুতে দিতাম না। আমি যখন খবর পেলাম, তখন সে বেরিয়ে চ'লে গেছে। আমিও আর থাকতে পারলাম না—থাকতে ইচ্ছাও হ'ল না।

সাক্ষী কাঁদিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ পর আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিল অন্ধকার বাদল রাত্রি সেদিন—কোলের মানুষ নজর হয় না, এমনই অন্ধকার। পিছল পথে বার বার পা পিছলে প'ড়ে যাচ্ছিলাম। গ্রামের বাইরে এসে আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম—ওগো, ওগো। ঝিপঝিপ ক'রে বৃষ্টির শব্দ আর বাতাসের গোঙানিতে সে শব্দ সে বোধ হয় শুনতে পায় নি। শুনলে সে দাঁড়াত—নিশ্চয় দাঁড়াত হুজুর। তবে আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। বাতাসটা সামনে থেকে বইছিল। সে গান করতে করতে যাচ্ছিল। বাতাসে সে গান পিছু দিকে বেশ ভেসে আসছিল।

সাক্ষী আবার নীরব হইল।

কিছুক্ষণ পর সে আবার আরম্ভ করিল—

আমি প্রাণপণে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পিছল পথে তাড়াতাড়ি চলবার উপায় ছিল না। সামনের থেকে জলের ফোঁটা কাঁটার মতো মুখচোখে বিঁধছিল। হঠাৎ একটা চীৎকার শব্দ কানে এসে পৌঁছল— বাবা, বাবা! শেষটা আর শুনতে পেলাম না। চিনতে পারলাম আমার স্বামীর গলা। ছুটে এগিয়ে যেতে গিয়ে পথে প'ড়ে গেলাম। উঠে একটু দূরে এগিয়ে যেতেই দেখি, একজোড়া আঙরার মত চোখ ধকধক ক'রে জ্বলছে। এই চোখ দেখে চিনলাম, সে আমার শ্বশুর। আমার শ্বশুরের চোখের তারা বেড়ালের চোখের মতো খয়রা-রঙের সে চোখ আঁধারে জ্বলে। অন্ধকারের মধ্যে চ'লে চ'লে চোখে তখন অন্ধকার স'য়ে গিয়েছিল, আমি তখন দেখতেও পাচ্ছিলাম। দেখলাম আমার শ্বশুর একটা মানুষকে কাঁধে ফেলে আখড়াইয়ের দিঘীর পাড় দিয়ে নেমে গেল। বুক ফেটে কান্না এল, কিন্তু কাঁদতে পারলাম না। গলা যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখে যেন আগুন জ্বলছিল। আমিও তার পিছন নিলাম।

সাক্ষীকে বাধা দিয়া বিচারক প্রশ্ন করিলেন, তোমার ভয় হ'ল না ?

সাক্ষী উত্তর দিল, হুজুর, আমরা বাগ্দীর মেয়ে। আমাদের মরদে খুন করে, আমরা লাশ গায়েব করি। হুজুর, আমার হাতে যদি তখন কিছু থাকত তবে ঐই খুনেকে ছাড়তাম না।

সাক্ষী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া আসামীকে আক্রমণের চেষ্টা করে। তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয়, ও তাহার উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া সেদিনকার মতো বিচার স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। সাক্ষী কিন্তু বলে যে, সে বলিতে সমর্থ এবং আর সে এরূপ আচরণ করিবে না।

সে কহিল, তারপর দীঘির গর্তে দেহটাও পুঁতে দিলে সে, আমি দেখলাম। তখন পশ্চিম আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়ালে উঠছিল। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সেই আলোতে পরিষ্কার চিনতে পারলাম, খুনী আমার শ্বশুর। সে বাড়ির দিকে হন্ হন্ করে চলে গেল। আমি পিছু ছাড়ি নাই। বাড়তে এসে লাফ দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে সে বাড়ি ঢুকল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অল্পক্ষণ পরেই কে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। চিনলাম, সে আমার শাশুড়ীর গলা। কিন্তু একবার কেঁদেই চুপ হয়ে গেল—

এই সময় আসামী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি তার মুখ চেপে ধরেছিলাম। হুজুর আর সাক্ষী-সাবুদে দরকার নাই। আমি কবুল খাচ্ছি। আমিই আমার ছেলেকে খুন করেছি। হুকুম পেলে আমি সব বলে যাই।

বিচারক এরূপ ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া আসামীকে স্বীকারোক্তি করিবার আদেশ দিলেন।

আসামী বলিয়া গেল হুজুর আমরা জাতে বাগ্দী। আমরা এক-কালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরব লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানীর আমলে আমাদের

পল্টনে কাজ যখন গেল, তখন থেকে আমাদের এই ব্যবসা। হুজুর চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ। মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হ'ল মেয়ের জাত। জমিদার বড়লোকের বাড়িতে এককালে আমাদের আশ্রয় হ'ত। কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে থানা-পুলিশের জবরদস্তিতে তারাও সব একে একে গেল। যারা টিকে থাকল, তারা শিঙ ভেঙে ভেড়া—ভালোমানুষ হয়ে বেঁচে রইল। তাদের ঘরে চাকরি করতে গেলে এক নীচ কাজ করতে হয়, গাড়ু বইতে হয়, মোট মাথায় করতে হয়, জুতো ঘুরিয়ে দিতেও হয় হুজুর। তাই আমরা এই পথ ধরি। আজ চার পুরুষ ধ'রে আমরা এই ব্যবসা চালিয়ে এসেছি। জমিদারের লগদীগিরি লোক দেখানো পেশা ছিল আমাদের। রাত্রির পর রাত্রি চামড়ার মত পুরু অন্ধকারে গা ঢেকে কুলীর ঘাঁটিতে ওৎ পেতে বসে থেকেছি। নেশায় মাথার ভেতর আগুন ছুটত। অন্ধকারের মধ্যে পথিক দেখতে পেলে বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠতাম। হাতে থাকত 'পাবড়া'—শক্ত বাঁশের দু-হাত লম্বা লাঠি, সেই লাঠি ছুঁড়তাম মাটির কোল ঘেঁষে। সাপের মত গোঙাতে গোঙাতে সে লাঠি ছুটে গিয়ে পথিকের পায়ে লাগলে আর তার নিস্তার ছিল না। তাকে পড়তেই হ'ত। তারপর একখানা বড় লাঠি তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়াতাম, আর পা দুটো ধ'রে দেহটা উলটে দিলেই ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত।

এই সময় একজন জুরি অজ্ঞান হইয়া পড়ায় আদালত সেদিনকার মত বিচার বন্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন বিচারক ও জুরিগণ আসন গ্রহণ করিলে আসামী বলিতে আরম্ভ করিল—

কত মানুষ যে খুন করেছি, তার হিসেব আমার নেই। সে সময় কোন কথা কানে আসে না হুজুর। তাদের কাতরানি যদি সব কানে আসত, মনে থাকত, হুজুর তা হ'লে সত্যি পাথর হয়ে যেতাম। মনে পড়ে শুধু দুটি মানুষের কথা। যেদিন আমার বাপের কাছে আমি

হাতে-খড়ি নিই আর আমি আমার ছেলে তারাচরণকে যেদিন হাতে-খড়ি দিই— দুদিনের কথা মনে আছে। সরল বাঁশের কোঁড়ার মত দীঘল কাঁচা জোয়ান তখন তারাচরণ। অন্ধকার রাত্রে শিকারের গলায় দাঁড়িয়ে বললাম—দে, পা ছুটো ধ'রে ধড়টা ঘুরিয়ে দে। সে থরথর ক'রে কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি শিকার শেষ করলাম, কিন্তু মনটা কেমন সেদিন হিম হয়ে গেল। মনে প'ড়ে গেল, প্রথমদিন আমিও এমনই ক'রে কেঁপেছিলাম। তারপর হুজুর, অভ্যেসে সব হয়—ক্রমে ক্রমে তারা আমার হয়ে উঠল গুলিবাঘ। পাতলা পা, পাথরের মত শক্ত ছাতি, শিকার পথের উপর পড়লে আমি যেতে-না যেতে সে গিয়ে কাজ শেষ ক'রে রাখত। ঘটনার দিন হুজুর—

আসামী নীরব হইল। সে পানীয় জল প্রার্থনা করিল। জল পান করিয়া সে কহিল, সে দিনের সে ভুল তারাচরণের, আমার ভুল নয়। তবে সে আমার ভাগ্যের দোষ। আর নয়তো যাদের খুন করেছি, তাদের অভিসম্পাতের ফল। তবে এ যে হবে এ আমি জানতাম। আমার বাবা বলেছিল, আমাদের বংশ থাকবে না—নির্বংশ হতেই হবে।

আবার আসামী নীরব হইল। আসামী কাতর হইয়া পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া আদালত কিছুক্ষণ সময় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আসামী তাহা চাহে না। সে কহিল, আর শেষ হয়েছে হুজুর। তবে আর একটু জল। পুনরায় জলপান করিয়া সে বলিয়া গেল—

সেদিন তারার আসবার কথা নয়। কুটুমবাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে বিয়ের রাত্রেই চ'লে আসবে, এ ধারণা আমি করতে পারি নাই হুজুর। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ঝিপঝিপ ক'রে বাদলও নেমেছিল। আমার বউমার কাছে শুনেছেন, আমার চোখ অন্ধকারে বেড়ালের মত জ্বলে। আমার চোখেও আমি সেদিন ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না। সর্বাঙ্গ ভিজে হিম হয়ে যাচ্ছিল

দুপ্রহর রাত পর্যন্ত শিকার না পেয়ে বিরক্ত হয়ে উঠে আসছি এমন সময় কার গানের খুব ঠাণ্ডা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতাসে বইছিল আমার দিক থেকে। আওয়াজটা বাতাস ঠেলে উজানে ঠিক আসছিল না। সেদিন হাতে পয়সাকড়ি কিছু ছিল না। মানুষের সাড়া পেয়ে অভ্যেসমত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে চলন্ত মানুষ নড়ছিল—মারলাম ফাবড়া। লাশ পড়ল। সে কি চীৎকার ক'রে বললে, কানে এল না। ছুটে গিয়ে গলায় লাঠি দিয়ে উঠে দাঁড়াব, শুনলাম, বাবা—বাবা—আমি—

কথাটা কানেই এল, কিন্তু মনে গেল না। তার গলা আমি চিনতে পারলাম না। লাঠির উপরে দাঁড়িয়ে বললাম, এ সময়ে বাপ সবাই বলে।

আসামী নীরব হইল। আবার সে বলিল, পেয়েছিলাম আনা-ছয়েক পয়সা আর তার কাপড়খানা।

আবার সে নীরব হইল। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

রায়ে বিচারক দণ্ডাদেশের পূর্বে লিখিয়াছেন—যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা নির্দেশ করিয়াছে। তাঁহারই নামে সৃষ্টি ও সমাজের কল্যাণে অন্যায় ও পাপের রোধ হেতু দণ্ডবিধির সৃষ্টি হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতিভূস্বরূপ বিচারক সেই বিধি অনুসারে অন্যায়ের শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। এই ব্যক্তির যে অপরাধ, বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের দণ্ডবিধিতে তাহার যোগ্য শাস্তি নাই। এ ক্ষেত্রে একমাত্র চরম দণ্ডই বিধি। আমার স্থির বিশ্বাস, সেইজন্যই সমগ্র বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালক তাহার দণ্ডবিধান স্বয়ং করিয়াছেন। চরমদণ্ড এ ক্ষেত্রে সে গুরুদণ্ডকে লঘু করিয়া দিবে। ঈশ্বরের নামে বিচারকের আসনে বসিয়া তাঁহার অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস ইহার শাস্তি বিহিত হইল।

রায় পাড় শেষ হইয়া গেল।

তিনজনেই নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনের বিচিত্র চিন্তাধারার পরিচয় বোধ হয় প্রকাশ করিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

অকস্মাৎ রমেন্দ্রবাবু কহিলেন, একটা কথা বলব সুরেশবাবু?

মৃদুস্বরে সুরেশবাবু বলিলেন, বলুন।

পুলিস এক্‌সিকিউটিভ আপনারা দুজনেই তো এখানে উপস্থিত রয়েছেন। দেহটা আর মর্গে পাঠাবেন না। ওই আখড়াইয়ের দীঘির গর্ভেই ওকে শুয়ে থাকতে দিন।

অনাত্মিক

সুবোধ ঘোষ

এক যে আছে একানড়ে ... এই একানড়ে কিন্তু তালগাছে চড়ে থাকে না। তার দাঁত দুটো মুলোর মত নয়। পিঠখানাও কুলোর মত নয়। ইনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চমৎকার চেহারা, গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

কোমরে বিচুলির দড়ি। বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি। না এই একানড়ের কোমরে ও রকমের কোন বিদঘুটে জঞ্জাল কেউ কখনও দেখতে পায়নি। বরং মাঝে মাঝে দেখা যায়, বিশেষ করে শীতকালের দুপুরে কিংবা বিকেলে, একটি বাদামী রঙের আলোয়ান কোমরে জড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন এই একানড়ে। অফিস থেকে সোজা বাড়ি। মাঝখানে কোথাও থামেন না, আশেপাশের কোন বাড়ির দিকে তাকান না। লোকের বাড়ি-বাড়ি বেড়াবার জন্যে এই একানড়ের মনে কোন সাধের তাগিদ নেই।

সুকিয়া স্ট্রীটের এক গলির একটি বাড়িতে অনন্ত মিত্তির নামে এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁরই বিশেষ একটি দুর্নাম বা সুনাম এই যে, তিনি একটি অদ্ভুত একানড়ে।

অনন্ত মিত্তির নামে এই ভদ্রলোক একলা থাকতে ভালোবাসেন। পাড়ার কোন উৎসবের ধারে কাছেও আসেন না। ছেলেদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিতেও তাঁর বেশ আপত্তি দেখা যায়। যদিই বা, অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু-এক টাকা চাঁদা কখনও দিয়েছেন, তবে বেশ গম্ভীর হয়ে আর মুখ ফিরিয়ে রেখে সেই চাঁদার টাকা জানালা দিয়ে বাইরের ছেলে-জনতার একজনের হাতে ফেলে দিয়েই ঘরের ভিতরে সরে গিয়েছেন। রসিদ নেবার জন্যে

অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকেননি। রসিদ নেবার জন্য কোন আগ্রহও তাঁর নেই।

রসিদের কাজটা জানালার ফাঁকে রেখে দিয়ে ছেলেরা চলে যায়। অনেকক্ষণ পরে, অনন্তবাবু নিজেই এসে সেই রসিদের কাগজটাকে টোকা মেরে জানালার বাইরে ফেলে দেন। কাগজটা যেন বাইরের পৃথিবীর যত ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের একলা সুখী জীবনটাকে একটা সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। একটুও পছন্দ করেন না অনন্ত মিত্তির। ক্লাবের ছেলেরাও অনন্তবাবুর এই নির্লিপ্ততা একটুও পছন্দ করে না। তাই ছেলেরাই ঠাট্টা করে কথাটাকে রটিয়েছে —একানড়ে।

গলির একুশ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা অনন্ত মিত্তির বাইশ বছর ধরে এই বাড়ির ভাড়াটে হয়ে দিন কাটিয়েছেন। পাড়ার জীবনে মাঝে মাঝে মেলামেশার আলোড়ন জাগে। কোন বাড়িতে বিয়ে, কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ। অনন্তবাবুও নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। টালিগঞ্জের মানুষও ঝড়-বৃষ্টির বাধা উপেক্ষা করে নিমন্ত্রণের প্রীতি-ভোজে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু পাড়ার মানুষ অনন্তবাবু আসেননি। সকলেই জানেন, হঠাৎ অসুস্থতা নয়, কোনও জরুরী কাজের চাপও নয়, অনন্তবাবু ইচ্ছে করেই আসেননি।

কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা আর অনন্তবাবুর মেয়ে শুভা, দুজনেই এসেছে। একুশ নম্বর বাড়ির এই দুটি মানুষ কোন নিমন্ত্রণের আহ্বান তুচ্ছ করে না। কিন্তু একথাও কারও জানতে বাকি নেই যে অনন্তবাবু তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের এই সব সামাজিকতার হৈ-চৈ একটুও পছন্দ করেন না। জানতে কোন অসুবিধে ছিল না কারণ রেণুকা নিজেই উৎসবের বাড়ির মেয়ে-মহলের জিজ্ঞাসার দাবি শান্ত করতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছেন, আসতে বেশ দেরি হলো। 'আসতে কি দেয়? শেষে একরকম ঝগড়া করেই চলে এসেছি।'

তবে আর জানতে ও বুঝতে কিসের অসুবিধে আছে? অনন্তবাবু

চান, তাঁর স্ত্রী আর মেয়েও একানড়ে হয়ে এই পাড়ার মধ্যে ভিন্নতর একটি একলা-জগৎ সৃষ্টি করে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিক।

অনন্ত মিত্তিরের এই বাড়ি, এই একুশ নম্বর, এই ভাড়া-বাড়ির ঘর বলতে একটি মাত্র ঘর। ঘরটি অবশ্য ক্ষুদ্র নয়, ঘরের বারান্দাও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেশ বড়। তবু শুধু একটি চেয়ার।

ক্লাবের ছেলেরাও বুঝে নিয়েছে, বাইরের মানুষ এখানে এসে যেন দশটা মিনিটও বসে থাকবার মত কোন ঠাঁই না পায়। সেই জন্যেই একানড়ে অনন্ত মিত্তির সাবধান হয়ে এই একটি মাত্র চেয়ার রেখেছেন। যদি হঠাৎ বাইরের দুজন ভদ্রলোক অনন্তবাবুর এই বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ান, তবে তাঁরা বসবেন কোথায়? এ রকমের কোন প্রশ্নই অনন্তবাবুর মনে নেই। অনন্তবাবু চান না যে, বাইরের মানুষ হঠাৎ এসে, একটা ভালো কথার ছুঁতো করে তাঁর বাড়িতে ভিড় করে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে তিনি ওই একলা চেয়ারটির উপর চুপ করে বসে থাকতে আর ভাবতে ভালবাসেন।

পাড়ার আর আশেপাশের বাড়ির বয়স্ক ভদ্রলোকেরা ঠাট্টা করে অন্য একটা কথা বলেন—স্বামী একলানন্দ। অনন্তবাবু সম্পন্ন অবস্থার মানুষ নন। দেশী মার্চেন্ট অফিসে কনিষ্ঠ পদের কেরাণী। কত টাকাই বা মাইনে পান? কিন্তু মনে হয়, যা পান তাতেই তিনি প্রসন্ন। এই বাইশ বছরের মধ্যে পাড়ার কোন মানুষের কাছে তিনি কখনও টাকা ধার চেয়েছেন, এমন ঘটনার কথা কেউ কখনও শোনেনি। অনন্ত মিত্তির কাউকে কখনও একটি পয়সা ধার দিয়েছেন বলেও কেউ শোনেনি। ভদ্রলোক কারও উপকার নেন না, কারও উপকার করেন না। সত্যিই মনে প্রাণে বিশুদ্ধ একটি একলানন্দ।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়িতে এসেই শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু, ঘরের ভিতরে অনেক মানুষের কলরব। কে ওরা? কেনই বা ওরা আসে আর এরকম একটা উৎপাত বাধিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘরের ভিতরে বসে থাকে। বেশ বিরক্ত হয়ে

আর ক্ষুব্ধ হয়ে বারান্দার সেই একলা চেয়ারটির উপর বসে থাকেন অনন্তবাবু।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে অনন্তবাবুর মেয়ে শুভা।
'একটু জিরিয়ে নাও বাবা, তারপর চা খেও।'

'তার মানে এই যে, আমার চা পেতে এখন বেশ দেরি হবে?' অনন্তবাবুর কথার মধ্যে আর গলার স্বরে তাঁর আন্তরিক বিরক্তিটা আরও তীব্র হয়ে বেজে ওঠে।

শুভা বলে, 'হ্যাঁ, একটু দেরি হবে।'

'কেন?'

'পেয়ালা নেই।'

'তার মানে?'

'তার মানে কমলা মাসিমাকে চা দেওয়া হয়েছে।

অনন্তবাবুর এই সংসারে যে একটি মাত্র চায়ের পেয়ালা আছে, সে পেয়ালা এখন অভ্যাগতা কমলা মাসিমার হাতের কাছে রয়েছে। সুতরাং অনন্তবাবুর চা পেতে একটু দেরি হবে বই কি।

শুভার চা খাওয়ার অভ্যেস নেই। শুভার মা রেণুকা অবিশ্যি চা খান। কিন্তু অসুবিধে নেই। সে জন্যে দ্বিতীয় একটি পেয়ালার দরকার হয় না। অনন্তবাবুর চা খাওয়া সারা হলে পেয়ালাটা যখন মুক্তি পায়, তখন রেণুকা সেই পেয়ালাতে নিজের চা ঢেলে নেন। কোন সমস্যা নেই।

এখনও বাইরের যাঁরা ঘরের ভিতরে বসে আছেন আর গল্প গুঞ্জন ও হাসাহাসির উৎপাত সৃষ্টি করছেন, তাঁদের মধ্যে শুধু নরহরিবাবুর স্ত্রী কমলার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে। সুমতির মা, মনোজের কাকিমা আর জয়া, কাজল, শান্তি, ওরা কেউই চা খায় না।

ওরা এই কথা বলেছে বলেই অনন্তবাবুর স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস করেছেন যে, সত্যিই ওরা চা খায় না। কিন্তু ভুল বিশ্বাস। ওরা জানে, একলানন্দ অনন্তবাবুর বাড়িতে একটি ছাড়া দুটি পেয়ালা

নেই। বেচারা রেণুকা মাসিমা অসুবিধেয় পড়বেন, অপ্রস্তুত হবেন, এক এক করে একটি পেয়ালাতে এতগুলি মানুষকে চা খাওয়াতে গিয়ে হায়রান হবেন, তাই ওরা আগেই মিথ্যে কথা বলে সমস্যাটাকে মিথ্যে করে দিয়েছে।

অনন্তবাবুর বিরক্তির সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার ভাবও আছে। ওরা চা নাই বা খেল; কিন্তু খাবার কি খায়নি? রেণুকা কি অন্তত একটি টাকার সিঙাড়া আনিয়ে ফেলেনি?

অনন্তবাবুর এই দুশ্চিন্তার সবই বর্ণে বর্ণে সত্য।

শুভাও বলে, 'আর সবাই শুধু খাবার খাচ্ছে চা খাবে না।'

অনন্তবাবু - কী খাবার?

শুভা—সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ।

অনন্তবাবু - কত টাকার?

শুভা - দু' টাকা।

অনন্তবাবু বেশ চমৎকার!

দুটি টাকা ক্ষয় করিয়ে দিয়ে এই উৎপাত বড় জোর আর পাঁচ মিনিট পরেই সরে যাবে। যাই হোক, একটা বিরক্তির ব্যাপারে হলেও দুঃসহ রকমের কোন ভয়ের ব্যাপার নয়। চা খাওয়ার পর, আরও একটি ঘণ্টা চুপ করে বসে থাকবার পর আবার প্রসন্ন হতে পারবেন অনন্তবাবু। এ ধরণের উৎপাত অনন্তবাবুর জীবনের বড় রকমের কোন ভয় নয়। রেণুকাকে শুধু একটু বুঝিয়ে বললেই হবে—একটু টান করে চলতে শেখ। ভুলে যেওনা যে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। সেজন্যে অন্ততঃ আটটি হাজার টাকার জোগাড রাখতে হবে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন অনন্তবাবু। দরজার কাছে যেন কোন আগন্তুকের পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে। তবে কী সেই উৎপাতটা আবার এসেছে? সেই দুঃসহ উৎপাত? অনন্তবাবুর এই একলা-জগতের ভিতরে ভয়ানক একটা অনধিকার প্রবেশ।

না, সেই উৎপাতটা নয়। ল্যাংড়া আমের ঝুড়ি মাথায় করে একটা ফেরিওয়ালা এসেছে।

'না, আম চাই না।' ফেরিওয়ালাকে হাঁকিয়ে দিয়ে অনন্ত মিস্ত্রির আবার তাঁর জীবনের সব চেয়ে প্রিয় ভাবনার মধ্যে একলা হয়ে বসে থাকেন।

মেয়ের বিয়ের জন্যে আটটি হাজার টাকার সঞ্চয় এখন প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। কাজেই অনন্তবাবু যেমন একটু নিরুদ্বিগ্ন হয়েছেন, তেমনই একটু বেশী সাবধানও হয়েছেন। এই সঞ্চয়ের উপর যেন কোন আঘাত না পড়ে। সংসার খরচের টাকা আগে রেণুকাকারই বাক্সে থাকতো। কিন্তু রেণুকার স্বভাবের একটি গোপন সত্য একদিন হঠাৎ জানতে পেরে সাবধান হয়ে গিয়েছেন অনন্তবাবু। স্মৃতির বিয়েতে বারো টাকা খরচ করে একটি বনেখালি শাড়ি আশীর্বাদী দিয়েছিলেন রেণুকা। অনন্তবাবুকে না জানিয়ে দত্তবাবুর ছেলে নৃপেনকে দিয়ে এই শাড়ি কিনিয়েছিলেন রেণুকা।

জানতে পেরে সেই যে সাবধান হয়ে গেলেন অনন্তবাবু, তারপর থেকে রেণুকার হাতের নাগালে পাঁচটাকার বেশি একটি টাকাও আর রাখতে দিতে পারেননি।

কলেজে পড়ছে শুভা। শুভার বড় মামা জানিয়েছেন, ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু অনন্তকে আটটি হাজার টাকা খরচ করতে হবে। তা না হলে এখানে শুভার বিয়ে সম্ভব হবে না। নগদ বরপণের দাবি নেই। কিন্তু বড় ঘরের সঙ্গে কাজ করতে হলে দানসামগ্রীর কিছু বড়ত্ব চাই। মেয়েকে অন্তত ত্রিশ ভরি সোনার সাজে সাজিয়ে দিতে হবে। বরযাত্রীর সংখ্যাও কম করে একশো জন হবে। কাজেই ⋯ ⋯

অনন্তবাবু জবাব দিয়েছেন, রাজি আছি। পাত্র দেখতে শুনতে ভালো। পাত্র বেশ বিদ্বান, রোজগার ভালোই। কলকাতাতে তিনতলা বাড়ি আছে। সুখে থাকবে শুভা। অনন্তবাবু আপত্তি করবেন কেন?

আপত্তি দূরে থাকুক, এটাই যে অনন্তবাবুর জীবনের এক মাত্র কামনার ধ্যান। যাঁরা অনন্ত মিস্তিরকে একলানন্দ বলেন, কিংবা একোনড়ে বলে ঠাট্টা করেন, তাঁরাও জানেন যে ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের কোন সুখের বা সাধের আবদারের কাছে কিন্তু একটুও কৃপণ নন।

রবিবারের সকালবেলাতে বন্ধু শুভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জয়া নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখেছে, তাতে জয়ার দু' চোখ অদ্ভুত এক বিস্ময়ে চমকে উঠেছে। বারান্দার এক কিনারায় বসে অনন্ত মিস্তির ব্যস্তভাবে দুহাত চালিয়ে তাঁর মেয়ের জুতো পালিশ করছেন।

বাপের আদুরে মেয়ে কতই তো দেখা যায়। আর আদুরে মেয়ের বাপও তো কতই আছে। কিন্তু অনন্ত মিস্তির যেসব কাণ্ড করেন, তার তুলনা নেই বললেই চলে। শুভা চেঁচিয়ে আপত্তি করে, রাগারাগি বকাবকিও করে, কিন্তু অনন্তবাবু যেন কিছুই শুনতে পান না। জ্বরের শরীর নিয়ে বিছানার উপর চুপ করে বসে শুভার শাড়ির ছেঁড়া আঁচল সেলাই করেন।

শুভা কোন দাবি করে না। তবু শুভার জন্যে বাজার থেকে হালফ্যাশনের দামী শাড়ি কিনে আনেন অনন্তবাবু। শুভাকে দেখতে যখন রোগা-রোগা মনে হবে, তখনই পাঁচসাত টাকা খরচ করে পুষ্টির মণ্ট কিনে ফেলবেন। মাঝে মাঝে অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে, বড়বাবুর কাছ থেকে বাড়ি যাবার অনুমতি নিয়ে সোজা মেয়ের কলেজের ফটকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বৈশাখ মাসের দিন, তাই অফিসের কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অনন্তবাবুর মনে একটা সন্দেহের প্রশ্ন ছটফট করে উঠেছে। মেয়েটা বোধ হয় ছাতা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে।

কলেজের ছুটির পর ফটকের বাইরে এসে দেখতে পায় শুভা, বাবা দাঁড়িয়ে আছে। শুভাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে শুভার মাথার উপর ছাতা ধরেন অনন্তবাবু। শুভা লজ্জা পেয়ে

ছটফটিয়ে ওঠে। 'কী করছো বাবা। আমাকেও বাবলু মনে করলে নাকি?' জয়া, কাজল আর শান্তি একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে থাকে।

মেয়ের বিয়ে হবে, যেদিন থেকে একথা শুনেছেন রেণুকা, সেদিন থেকেই তাঁর চোখ দুটো যখন তখন ছল্‌ছল্‌ করে। মাঝে মাঝে ঘরের ভিতরে একলা বসে বিড়বিড়ও করেন, নিজের কথা ভাবছি না। ভাবছি, এই মানুষটার কী দশা হবে?

রেণুকার বাতের ব্যথা আজকাল আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে। তার উপর হার্টের অবস্থাও ভালো নয়। মাঝে-মাঝে এমনও হয় যে, কাজের মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, জোরে জোরে শ্বাস টানেন। তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ্য থাকে না, শুয়ে পড়েন। অনন্তবাবু অফিস থেকে ফিরে এলে রেণুকা নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরী করে দিতেও পারেন না।

কিন্তু শুভা আছে। অনন্তবাবুর প্রত্যেকটি দরকারের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে মেয়ে যেন কান পেতে আছে। অনন্তবাবু যদি ডাক না দেন, তাতেই বা কি আসে যায়? শুভা ঠিক সময়েই কাছে এসে দাঁড়াবে। বাজারের ঝোলাটি অনন্তবাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দেবে। এই যে, একটানা তিন বছর ধরে উলের জামাটা গায়ে দিচ্ছেন অনন্তবাবু সেটা শুভারই হাতের কাজ। অনন্তবাবু জানেন না, রাত জেগে পাঁচদিনের মধ্যে এই জামাটি বুনেছিল শুভা। তা ছাড়া উপায় ছিল না। ধারণা করতে পারেনি শুভা, নভেম্বর মাসটা শেষ না হতেই শীতের মেজাজ এত প্রখর হয়ে উঠবে।

মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে পুরো দুটি গেলাস জল খাওয়া অনন্তবাবুর অভ্যেস। কিন্তু সেজন্যে অনন্তবাবুকে কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। শুভা যেন ওর ঘুমের নিয়মটাকেও চেষ্টা করে গড়ে নিয়েছে। ঠিক মাঝরাতে শুভা উঠে এসে অনন্তবাবুর বিছানার কাছে দাঁড়ায়। অনন্তবাবুর নিবিড় ঘুমের স্বপ্নটাও যেন একটা স্নিগ্ধ স্পর্শের

খাব পেয়ে চমকে ওঠে। কারণ অনন্তবাবুর কপালে হাত রেখে ডাক দেয় শুভা, 'বাবা, জল খাও।'

রেণুকা বলেন, 'আমাকে তো ভগবান যত রোগজ্বালা দিয়ে আধমরা করে রেখেছেন। এই মানুষটার জন্যে আমি কতটুকু করতে পারি। যা করে, মেয়েই করে। হাত মোছার তোয়ালেটি মেয়েই বাপের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই মেয়ে যখন পরের বাড়ি চলে যাবে, তখন বাপের দশা কী হবে?'

কিন্তু অনন্তবাবুর আসন্ন ভবিষ্যতের দুখের ছবিটা কল্পনা করে শুধু রেণুকাই যত আক্ষেপ করেন। অনন্তবাবুর চোখের চাহনিতে, মুখের ভাষায়, কিংবা চিন্তার মধ্যেও কোন আক্ষেপ নাই। বরং দেখা যায়, মেয়ের সুখের জীবনের রূপটাকেই কল্পনা করে অনন্তবাবু যেন তাঁর মন-প্রাণ বিচিত্র এক তৃপ্তি দিয়ে ভরে রেখেছেন। খবর পেয়েছেন অনন্তবাবু, শুভার ভাবী শ্বশুর নতুন গাড়ি কিনেছেন। শুভার ভাবী শ্বশুর জগৎবাবু বলেছেন, প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিন শুভাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাবেন। মন্দিরের আরতী দেখে, আর ঘাটের সিঁড়িতে বসে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে নিয়ে তারপর বাড়ী ফিরবেন।

এ তো নিতান্ত কল্পনার ছবি নয়, এ যে অনন্তবাবুর জীবনের এক সফল স্বপ্নের ছবি। লোক না বুঝুক রেণুকা কেন না বুঝবে, মেয়েকে ভাল ঘরে দেবার জন্যেই তো এই মানুষটা তার সারা জীবনে কেরানীগিরির সামান্য উপার্জনের উপর কঠোরভাবে খবরদারী করে কিছু টাকা জমাতে চেয়েছিল। নিজের গায়ের গরম জামার জন্যে উল কিনতে কি সহজে রাজি হয়েছিল এই মানুষটা? শুভা রাগ করে বাপের সঙ্গে কথা বন্ধ করেছিল বলে শেষে বাধ্য হয়ে সেই উল কিনেছিলেন বাপ।

রেণুকাকে অনেকবার বেশ কঠিন একটা খোঁচা মেশানো কথার আঘাত পেতে হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে কি যেন ভাবলেন অনন্তবাবু। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমার দশা তো স্বচক্ষেই

দেখতে পাচ্ছি। আমার মতো মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হওয়াই ভালো ছিল। খুব ভুল করেছ তুমি।

রেণুকা—আমি ভুল করিনি।

অনন্তবাবু—জানি, তোমার বাবা ভুল করেছিলেন। একই কথা। কিন্তু তোমার মেয়ের বাবা আর এ ভুল করবে না। খেয়ে পরে সুখে থাকবে, এমন ঘর না পেলে মেয়ের বিয়েই দেব না।

ভালো ঘর পেতে হলে ভালো খরচ করতে হবে, এই সার সত্যটিকে খুব ভালো করেই বুঝে নিয়েছিলেন অনন্তবাবু। স্মরণ করতেও ভুলে যাননি, রেণুকার বাবার পক্ষে টাকা খরচের সামর্থ্য ছিল না বলেই অনন্ত মিত্রের মতো পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিয়েছিলেন।

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অনন্তবাবু চোখে মুখে অদ্ভুত একটা গর্বের তৃপ্তিও মাঝে মাঝে ফুটে উঠতে চায়।

মেয়ের বিয়ের কথা মনে করতে গিয়ে মায়ের চোখ ভিজে যায়। বাপের শুকনো চোখ কিন্তু খটমট করে। মেয়ের মা যেমন আগে তেমনি আজও বিশ্বাস করেন, মেয়ের বাপ এই ভদ্রলোকের মনটা সত্যিই লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা কঠিন মন। যে মেয়ে এই বাপের কাছে সর্বক্ষণের মায়ার পুতুল, সে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে শূন্য হয়ে যেতে হবে, সেজন্যে মনের কোণে একটুও ব্যথা বেজে ওঠে না। কোনদিনও দেখা গেল না যে ভদ্রলোকের চোখ দুটো একটু স্যাঁতসেঁতে হয়েছে।

অনন্তবাবু বরং সেই শুকনো চোখের চাহনি তীব্র করে দিয়ে আরও ভয়ানক একটা খোঁচা-মেশানো কথা রেণুকাকে শুনিয়ে দিয়েছেন। আমি কাঁদবো কেন? কাঁদবে তুমি, কারণ ভয় তোমার।'

'কিসের ভয়?'

'শুভা চলে গেলে তোমার বাতের শরীরে খাটুনি আরও বাড়বে, এই ভয়।'

'এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে ?'

'যা দেখছি তাই বলছি।'

'কি দেখছো ?'

'ওই যে, বসন্তদা'র মেয়েটা এলেই তুমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে যাও।'

হাঁ, বসন্তদা'র মেয়ে চারু। আজ এক বছর ধরে এই মেয়েটাই অনন্ত মিত্রের জীবনের একটা দুঃসহ উৎপাত একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, রেণুকা এই মেয়েটাকে বেশ সহ্য করতে পারছেন। মেয়েটা যখন এ বাড়ীতে আসে আর দু-চার দিন থাকে, তখন রেণুকার জীবনটা যেন চমৎকার এক প্রিভিলেজ লাভের আনন্দে একেবারে অলস হয়ে যায়। রান্না থেকে শুরু করে দু'বেলা বারান্দা ধোওয়া পর্যন্ত, সব কাজ এই মেয়েই ক'রে -যার নাম চারু। এমন কি শুভাকেও চুপ করিয়ে বসিয়ে রাখে চারু। কোন কাজ করতে দেয় না।

সে সময়, এ বাড়ির একলাসুখী আর আপনসুখী জীবনের নিয়মটিয়ম সবই কেমন যেন ওলট পালট হয়ে যায়। শুভা নয়, ওই চারু মেয়েটাই ব্যস্তভাবে ছুটে এসে বলে 'পান নাও কাকা।'

অফিসে যাবার সময় চাদরটি কাঁধে ফেলে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অনন্তবাবু। খুবই তিক্ত, অপ্রসন্ন ও বিরক্ত মুখ। একটা পান মুখে দেবার ইচ্ছে থাকলেও, সেকথা মুখ খুলে বলতে পারেন না। বলতে ইচ্ছেও করে না। বললেই তো ওই মেয়েটা তখুনি ব্যস্ত হয়ে পান সাজতে বসে যাবে। রেণুকা খাটের উপর বসে শুধু তাকিয়ে থাকবে। আর শুভাটা গুনগুন করে গান গাইবে। অনন্তবাবু একটুও পছন্দ করেন না যে, বসন্তদার মেয়ে চারু, পান হাতে নিয়ে এভাবে ছুটে এসে কাছে দাঁড়ায়।

কে এই বসন্তদা, যাঁর মেয়ে চারু ? অনন্তবাবুর কাছে বসন্তদা আজ একটা নাম মাত্র। আত্মীয় নন, ঠিক কুটুম্বও বলতে পারা যায় না। সম্পর্কের দিক দিয়ে বসন্তদা যেন একটা ছায়াকুটুম্ব। শুধু মনে আছে,

খুড়তুতো দাদার বিয়েতে, প্রায় ত্রিশ বছর আগে বরযাত্রী হয়ে নদীয়া জেলার এক গ্রামে যেতে হয়েছিল। সে গ্রামে তিনদিন থাকা হয়েছিল। আর নতুন বউদির এক মাসতুতো দাদার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল, তিনিই বসন্তদা। সারা রাত জেগে বসন্তদার সঙ্গে তাস খেলা হয়েছিল। একদিন জাল নিয়ে বসন্তদার সঙ্গে নদীতে মাছ ধরাও হয়েছিল নৌকার লগি ঠেলেছিলেন বসন্তদা। আর অনন্ত জাল ফেলে সের দশেক কালবোশ আর কলুই তুলেছিল। সেই বসন্তদা। বলেছিলেন, 'আমার বিয়েতে নেমন্তন্নের চিঠি দেব অনন্ত, আসতে ভুলে যেও না।'

একদিন সেই বসন্তদার বিয়ের চিঠি এসেছিল ঠিকই। কিন্তু বিয়েতে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ পুরোনো দিনের স্মৃতির মাত্র এটুকু বিবরণ স্মরণ করতে পারেন অনন্ত মিত্র। কিন্তু আর কিছুই জানেন না।

সেই বসন্তদা আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণের সেই চিঠির পর কোথায় ছিলেন, কি করতেন, আর কতদিন বেঁচে ছিলেন বসন্তদা, কিছুই জানেন না অনন্ত মিত্তির। কোন দিন জানবার দরকারও হয়নি। চেষ্টা করলে, বসন্তদার চেহারাটা আজ স্পষ্ট করে কল্পনা করতেও পারবেন না অনন্তবাবু।

শুভা যে নতুন হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট্‌ শিখছে, তার জন্যে ভালো শোলা চাই। শুভা নিজেই একটা ঠিকানা দিয়েছিল, বরাহনগরের এক দোকানের ঠিকানা, যেখানে এই শোলা পাওয়া যায়। সেই শোলা কিনতে গিয়েই তো বিপদ হলো।

বরানগরের পথে ছেলেবেলার বন্ধু মাধব সেনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাধব সেন বললেন, 'আমাদের পাড়াতে তোমার এক বউদি থাকেন। তিনি প্রাইমারী স্কুলের টিচার।'

অনন্তবাবু আশ্চর্য হন, 'এ রকমের কোন বউদি আমার নেই।'

'কি আশ্চর্য, উনি যে তোমার নাম করে অনেক কথাই বললেন।'

'কি বললেন ?'

'আমার বাড়ি হেমতপুর শুনে উনি বললেন, আমার এক দেখা অনন্ত মিত্তিরও হেমতপুরের মানুষ। তখন বুঝলাম, তুমি ছাড়া হেমন্তপুরের অনন্ত মিত্তির আর কেই বা হবে ?'

বিস্ময়ের কথাই বটে। তাই মাধব সেনের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বরানগরের বস্তিগোছের একটা পাড়ার একটি ঘরের দরজার কাছে এসে, যাঁকে দেখতে পেলেন ও যাঁর পরিচয় পেলেন অনন্তবাবু, তিনি হলেন বসন্তদার বিধবা স্ত্রী। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরই মঙ্গলা বউঠান।'

ইচ্ছা ছিল না, তবু বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিলেন অনন্তবাবু মনের দিক থেকে কোন তাগিদ নেই, তবু মুখের কথায় মঙ্গলা বউঠানকে অনুরোধ করলেন অনন্তবাবু, সময় করে আমাদের ওখানে যাবেন একদিন।'

মঙ্গলা বউঠান ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিলেন 'চারু এদিকে আয়, কাকাকে প্রণাম কর।'

চারু আসে, অনন্তবাবুকে প্রণামও করে। এর পর হয়তো আরও এক-দুই মিনিট থাকতেন অনন্তবাবু। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না কারণ, হঠাৎ যে-কথা বলে উঠলেন মঙ্গলা বউঠান, তারপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়।

মঙ্গলা বউঠান বললেন, 'এমন কাকা যখন মাথার উপরে আছেন এখন তোর কোন ভাবনা নেই চারু।'

তখুনি একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল অনন্তবাবুর কিন্তু সামলে নিয়েছিলেন।

বয়স কুড়ি-একুশের কম নয়, দেখতেও ভালো। চারুর মুখের দিকে চোখ পড়বামাত্রই ভয় পেয়েছিলেন অনন্তবাবু। কোথাকার কোন্ এক বসন্তদা, যিনি আজ ভবপারে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, তাঁরই মেয়ে এই চারু কেন যে বিধবা মায়ের জীবনের দুশ্চিন্তা হয়ে উঠেছে, সেটা কি বুঝতে একটুও দেরি হবার কথা?

চারুর বিয়ে হয়নি। আর এই মঙ্গলা বউঠানও কী সাংঘাতিক মতলবের মানুষ। এক কথায় পথের একটা মানুষকে মেয়ের কাকা করে নিয়ে, সেই মেয়ের জন্যে ভাবনার সব দায় কাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

শুধু ভয় নয়, বিরক্তিও নয়, বেশ একটু ঘৃণাও বোধ করেছিলেন অনন্তবাবু। আর কোন কথা না বলে চলেও এসেছিলেন।

কিন্তু পলাইতে পথ নাই, মঙ্গলা বউঠান আছে পিছে। এই মঙ্গলা বউঠান নিজেই চারুকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তবাবুর এই বাড়িতে কয়েকবার এসেছেন আর চলে গিয়েছেন। একদিন রেণুকার হাতের কষ্ট দেখে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে গেলেন মঙ্গলা বউঠান। 'চারু কটা দিন এইখানেই থাকুক। ঘরের সব কাজ চারুই করবে। তুমি একটুও ভেব না রেণু।'

সত্যি কথা, রেণুকার ইচ্ছা ছিল চারু কটা দিন থাকুক। শুভারও খুব গরজ, চারুদি কটা দিন এ বাড়িতে থাকুক।

কাজের সাহায্য হবে, হাঁ, এটা স্বল্পবুদ্ধি রেণুকার মনে অবশ্যই ছিল। আর শুভার মনে এই লোভও ছিল, চারুদি থাকলে যখন-তখন চারুদির গান শুনতে পাওয়া যাবে। চারুদির গলা বড় মিষ্টি। চারুদির চোখ দুটো বড় সুন্দর। চারুদি চমৎকার খোঁপা বাঁধবার আর্ট জানে।

এই এক বছরের মধ্যে এই চারু এই বাড়িতে অন্তত দশবার এসেছে। কোনদিনও চিঠি দিয়ে চারুকে কখনও আসতে বলা হয়নি। মেয়েটা নিজেই এসেছে। অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কি ব্যাপার?'

চারু হাসতে থাকে। মা বললে, 'যা একবার গিয়ে দেখে আয়, তোর কাকিমা কেমন আছেন।'

অনন্তবাবু—দেখলে তো বেশ ভালই আছেন।

চারু আবার হাসে—না কাকা, কাকিমার হাঁটুতে একটা ব্যথা কন্‌কন্ করছে, ভাল করে হাঁটতে পারছেন না।

—তা তুমি আর কি করবে?

—আমি দুটো দিন থেকে যাই কাকা। শুভারও পরীক্ষার সময়। একা কাকিমা এই হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ঘরের কাজ সামলাবেন কি করে?

রেণুকা বুঝতে পারে না। শুভার তো বুঝবার মত বুদ্ধিই হয়নি যে মঙ্গলা বউঠান নামে এক মতলববাজ মহিলা কী ভয়ানক চাল চেলেছেন। কোথাকার কোন্ বসন্তদা তাঁর মেয়ের কাছ থেকে অনন্তবাবুর সংসার উপকার নিতে গিয়ে কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে, সেটা অনুমান করতে পারেন অনন্তবাবু। এইবার একদিন হঠাৎ এখানে এসে মঙ্গলা বউঠান যখন দাবি করবেন, আমার মেয়ের বিয়ের খরচ দিন তখন কি হবে?

অনন্তবাবু বলেন, 'তুমি কেন মিছিমিছি বারবার ছুটে আস চারু। আমাদের সুবিধে-অসুবিধে আমরাই বুঝবো। মঙ্গলা বউঠান তোমাকে এখানে যখন তখন পাঠিয়ে দিয়ে, বড়ই অন্যায় করেন।'

চারু হাসে, 'আমিও তো তাই বলি। কিন্তু আমাকে উল্টে ধমকে দিয়ে মা বললে আপনজনের দরকারের কাজে, নিজেই যেচে যেতে হয়। পর তো নয় যে চিঠি দিয়ে ডাকবে।

এসব কথার উত্তর দেওয়া অনন্তবাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু বুঝতে পারেন, খুবই কঠিন এক বুদ্ধির চক্রান্ত অনন্তবাবুর জীবনের এক সঞ্চয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে।

চারুর সঙ্গে খুব কম কথা বলেন অনন্তবাবু। চারু যখন এ বাড়িতে থাকে আর ঘুরঘুর করে সর্বক্ষণ কাজ করে, তখন সে দৃশ্য দেখতে একটুও ভাল লাগে না। মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যায়, জল খাওয়ার জন্য বিছানার উপর উঠে বসেন, তখন বস্তু হয়ে কঠিন একটা ছায়া যেন ঘরের ভিতরে ঢুকে কথা বলে, 'জল খাবে কাকা?'

শুভা নয়, চারু এসেছে। অনন্তবাবুর পিপাসাটাও যেন বিরক্ত হয়ে উঠে। জল খাওয়ার স্পৃহাও নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু চারু জল নিয়ে আসে। অনন্তবাবুও জল খান।

চারু যেই কটা দিন এখানে থাকে, তখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেই দেখতে পান, অনন্তবাবুর ঘরের চেহারা ঝকঝক করছে। আর বসন্তদার মেয়ে এই চারু, উনানে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে বসে আছে।

—কাকিমা কোথায়?

—সুমতি মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন।

—তোমার কাকিমার না হার্টের কষ্ট বেড়েছে!

চারু হাসে—এ'বেলা ভাল আছেন।

—শুভা কোথায়?

—জয়া এসেছিল, শুভা বোধহয় জয়াদের বাড়িতে গিয়েছে।

অনন্তবাবুর মনের ভিতরে একটা বিদ্রোহ যেন গর্জন করে উঠতে চায়। কী অদ্ভুত কাণ্ড। কোথাকার এক বসন্তদার মেয়ের কাছে এবাড়ির আত্মাটা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে। তাই মা আর মেয়ে দুজনেই বেড়াতে বের হয়েছেন। জীবনে কারও কাছ থেকে কোনও উপকার গ্রহণ করেনি যে মানুষ, সে মানুষকে আজ বসন্তদার মেয়ের হাত থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিতে হবে। মেয়েটাও অদ্ভুত। উনানের ধোঁয়াতে ছোট রান্নাঘরটা ভরে গিয়েছে, তারই মধ্যে বসে আছে চারু। মেয়েটাকে ভয়ানক এক উপকারের তপস্বিনীর মতই দেখাচ্ছে।

মঙ্গলা বউঠানের মতলবের কাছে হার মানবেন, তেমন মূর্খ মানুষ নন অনন্তবাবু। তাঁর মনটাও নরম কাদা দিয়ে তৈরী কোন তুলতুলে পদার্থ নয়। চারুর জীবনের জন্য ভাবনা করবার কোন দায়িত্ব তাঁর নেই। মঙ্গলা বউঠান বুঝে নিন, তাঁর মেয়ের ভাগ্য কী বলে? বিয়ে হবে, কি হবে না?

বসন্তদার মেয়ে চারুর সঙ্গে ভুলেও একটা হাসির কথা বলাবলি করেন না অনন্তবাবু। অনন্তবাবু জানেন মঙ্গলা বউঠান, আর তাঁর মেয়ে এই চারু, দুজনেই ধূর্ত মতলবের প্রাণী, যারা মানুষের মনের দুর্বলতা বা কোমলতার গন্ধ পেলেই পেয়ে বসবে। হয়তো

আট হাজার টাকার চার হাজার টাকা এই ছলনায় লুঠ করে নিয়ে সরে পড়বে। কোথাকার কোন বসন্তদার মেয়ে চারুর বিয়ে হয়ে যাবে; আর নিজের মেয়ে শুভার বিয়ের আশাটাই ছলনা হয়ে অনন্ত মিত্তিরের জীবনের সবচেয়ে বড় সুখের স্বপ্নটাকেই ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

না, অসম্ভব। অনন্ত মিত্তির পাগল হয়ে গেলেও এমন ভুল করবেন না। এই চমৎকার চতুর কপটতার কাছে ঠকতে পারেন না।

চারুকে দেখতে যেমন ভাল না, ভাবতেও তেমনি বেশ ঘৃণা বোধ করেন অনন্তবাবু। রেণুকাকে অনেকবার আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু—সত্যি কথা এই যে, চারুকে আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি চাই না যে, কোন ছুতো করে চারু এখানে বার বার আসে আর থাকে। তোমরাও একটু সাবধান হও।

অনন্তবাবু নিজেই সবচেয়ে বেশি সাবধান হলেন। শুভার বড়মামা যেদিন চিঠি দিলেন, এইবার প্রস্তুত হলে ভাল হয়, সেদিনই জবাব দিয়ে দিলেন অনন্তবাবু, 'আমি প্রস্তুত'।

যাঁর মুখে কোনদিন হাসি দেখতে পায়নি পাড়ার কোন মানুষ, সেই অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে অদ্ভুত এক গর্বের তৃপ্তি হেসে ওঠে। গভীর এক নিশ্চিন্ততার হাসিও বটে। এ হাসটাই যে অনন্তবাবুর ভাগ্যের চরম লাভ। সব বাধা ব্যাঘাত জয় করতে পেরেছেন। মেয়েকে বড় ঘরে বিয়ে দিতে পারবেন। অনন্ত মিত্তির এইবার এই হাসিমুখ নিয়ে বাকি জীবন পার করে দিতে পারবেন।

পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা দেখে আশ্চর্য হয়েছে, অনন্তবাবুর সেই গম্ভীর মুখ আর নেই। অনন্তবাবুর মুখে সব সময়ই হাসি ফুটে রয়েছে।

শুভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বড়মামা নিজেই এ বাড়িতে এসে বিয়ের সব কাজ চুকিয়ে দিয়েছেন।

পাড়ার মানুষও খুশি হয়ে শুভার বিয়ের প্রীতিভোজ খেয়েছে কিন্তু মেয়ের বিয়ের দিনেও একলানন্দ অনন্তবাবুকে পাড়ার ভদ্রলোকেরা দুটো কথা বলবার সুযোগ পেলেন না। তিনি বাড়ির ভিতরেই ছিলেন। বিনা কাজে একাই ঘুরঘুর করছেন, আর বার বার এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছেন।

রেণুকার চোখ তো সকাল থেকেই ছলছল করছিল। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখে হাসি। অদ্ভুত উজ্জ্বল হাসি। সকলেই বলছেন, খুব ভাল ঘরে শুভাকে দিতে পেরেছেন অনন্তবাবু। অনন্তবাবুর প্রাণের গর্ব না হেসে থাকতে পারবে কেন?

বিয়ের দিন মঙ্গলা বউঠান এসেছিলেন। বিয়ের দিনেই চলে গেলেন। কিন্তু চারু ছিল। রেণুকা একটা কথা কতবারই না বললো। 'চারু না থাকলে আমার এই ভাঙা শরীরের হাড়গোড় কিছুই আর থাকতো না। উঃ, মেয়েটা দিনরাত কী খাটুনই না খেটেছে।'

কথাটা শুনতে পেয়েছেন অনন্তবাবু। কিন্তু তার মনে কোন বিকার নেই। তিনি শুধু একবার জবাব দিতে গিয়ে রেণুকাকে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, 'চারুকে কেউ কি দিব্যি দিয়েছিল যে খাটতে হবে?'

ভয়ানক এক গোঁয়ার বুদ্ধিহীনের বাজে কথার মত, এই কথাটা রেণুকার কানে লেগেছে। খুব আশ্চর্য হয়েছেন রেণুকা। বুঝতে পারেন না রেণুকা, চারু মেয়েটার সব কাজের মধ্যেই একটা অপরাধ আবিষ্কার করেন কেন এই ভদ্রলোক।

রেণুকা শুধু বলেন, 'কী অদ্ভুত মানুষ তুমি।'

অনন্তবাবু বলেন, 'আমাকে গালমন্দ করো না। শুধু বিশ্বাস কর, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি।

শুভা যেদিন চলে গেল, সেদিন রেণুকার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে স্মৃতির মা নিজেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। কে না

জানে, মেয়ে বিদায়ের দৃশ্যটা মেয়ে মহলের চোখে কান্নাভরা করুণতা না জু গিয়ে পারেন না।

কিন্তু মেয়ের বাপের চোখ কি এত শুকনো খটখটে হয়, আর এত হাসি নিয়ে ঝকঝক করতে পারে? লোক জানে, পারে না। কিন্তু অনন্তবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে সকলেই এই বিরল বিস্ময়ের ব্যাপার দেখতে পেয়েছে, সত্যিই অনন্তবাবু হাসছেন। যেন বিজয়ীর গর্বের হাসি। যেন সারা জীবনের সাধনার সফলতার হাসি। শুভার শ্বশুর নতুন গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। সেই গাড়িতে স্বামীর পাশে বসে চলে গেল শুভা। রেণুকাকে একবার একলা পেয়ে কথাটা বলেও নিলেন অনন্তবাবু। 'কাঁদবো কেন? মেয়েকে তো জলে ফেলে দিইনি যে কাঁদতে হবে।'

সুকিয়া স্ট্রিটের গলিতে একুশ নম্বর বাড়ির অনন্ত মিত্তিরের জীবনে কোন ব্যথা নেই। শুভার তোয়ালেটার দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন রেণুবা। কিন্তু অনন্তবাবু বারান্দায় পায়চারী করেন আর গুণ গুণ করে গান করেন।

শুভা নেই। কিন্তু, চারু এখনও আছে। বিয়ের পর পাঁচটা দিন পার হয়ে গিয়েছে তবু চারু আছে।

কেন আছে চারু? নিজেকে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পান না অনন্তবাবু।

অফিসে যাবার সময় হয়। চারু এসে অনন্তবাবুর হাতের কাছে পানের ডিবে এগিয়ে দেয়। শুভার একটা অভ্যেস ছিল, মাঝে মাঝে মিছরির সরবৎ তৈরী করে নিয়ে অনন্তবাবুর চায়ের পিপাসাকে বাধা দিত। 'না, যা গরম পড়েছে, আর চা খেতে পাবে না। সরবৎ খাও বাবা।'

কি আশ্চর্য, কোথাকার কোন্ এক বসন্তদার মেয়ে এই চারুও বলে 'এই গরমে আর চা খেও না কাকা। সরবত খাও।'

সরবত খান অনন্তবাবু। কিন্তু জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যান না 'তুমি তো এবার বরাহনগর চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, কাকা।'

সামান্য একটা কথা। কিন্তু এই সামান্য কথাটা বলতে গিয়ে চারু যেন মুখ লুকোতে চেষ্টা করে। লজ্জা? কিসের লজ্জা? মঙ্গলা বউঠানের মত ধুরন্ধরা নারীর মেয়ের মুখে এই লজ্জা একটুও মানায় না। পরের বাড়িতে থাকতে যদি কোন লজ্জার বাধা থাকতো, তবে বারবার এখানে এসে ঠাঁই নেবার এত চেষ্টা করতো না।

সেদিন রবিবার। অনন্তবাবু বাড়িতেই ছিলেন। সারা দুপুর ধরে অনন্তবাবুর কামিজের ছেঁড়াগুলিকে সেলাই করেছে চারু। বিকেল যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর হাতের কাছে সরবতের গেলাস এনে ধরেছে চারু। সন্ধ্যা যখন হয়েছে, তখন অনন্তবাবুর বিছানার চাদর বদলে দিয়েছে চারু।

রাত্রিবেলা সুজির পায়েস খেতে ভালবাসেন অনন্তবাবু। শুভারই কাজ ছিল, সুজির পায়েসটা শুভা নিজের হাতেই তৈরী করতো। রেণুকার হাতে সুজির পায়েস ভাল হয় না।

অনন্তবাবুর রাতের সুজির পায়েস আজও মিথ্যে হয়ে গেল না, যদিও শুভা নেই। চারু তৈরী করেছে সুজির পায়েস।

মাঝরাতেও সেই একই ব্যাপার। শুভা নেই, তবু অনন্তবাবুকে জল খাওয়াবার জন্যে একটি মেয়ে ঠিক তাঁর বিছানার কাছে উপস্থিত হয়েছে। 'চারু নাকি?' শুধু মৃদুস্বরে একটা প্রশ্ন করেন অনন্তবাবু। চারু বলে, 'হ্যাঁ, কাকা।'

সকাল হয়েছে। অনন্তবাবু জেগেছেন, তবু শুয়ে আছেন। অনন্তবাবু জানেন, শুভা নেই। আজ আর শুভা চা নিয়ে আসবে না। ঠিক তখনই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে চারু। 'ওঠো কাকা, মুখ ধুয়ে নিয়ে চা খাও।'

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু চুমুক দিয়েছেন অনন্তবাবু, ঠিক তখনই চারু আবার ঘরে ঢুকেই অনন্তবাবুকে প্রণাম করে, 'যাই কাকা।'

চারুর হাতে একটা ঝোলা। বেশ চমৎকার ষ্টাইল করে একটা শাড়িকে গায়ে জড়িয়েছে চারু। কি আশ্চর্য। বসন্তদার এই মেয়েকে যে মস্ত এক বড় লোকের মেয়ের মত দেখাচ্ছে।

'এস।' সামান্য একটা কথা। কিন্তু বলতে পারলেন না অনন্তবাবু। বলতে ইচ্ছেও নেই। যাও, কথাটা ভাল শোনায় না বলেই বলতে পারলেন না। অনন্তবাবু শুধু বললেন, 'হুঁ।'

চলে গেল চারু।

রেণুকা ঘরে ঢোকেন। 'খবরটা বোধহয় জান না?'

'কিসের খবর?'

'চারু আর এখানে আসতে পারবে না।'

'কেন?'

'চারুর বিয়ে।'

চমকে ওঠেন অনন্তবাবু। রেণুকা বলেন, চারুর মা সেদিন দুঃখ করে অনেক কথাই বলে গেলেন।'

'কি কথা?'

টাকা পয়সা না থাকলে যা হয়, তাই হয়েছে। চারুকে খুব এক গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে হচ্ছে। বেশ বয়স্ক ছেলে। দেখতে শুনতে একটুও ভাল নয়, রোজগারও সামান্য। মোট কথা, বেশ অভাবের ঘর। বিয়েতে পাত্রপক্ষের কোন দাবি নেই, এক পয়সাও খরচ নেই। কাজেই রাজি হয়েছেন মঙ্গলা বউঠান।'

'এ কি রকম ব্যাপার হলো?' অনন্তবাবুর হাতের পেয়ালা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

'যা হবার ছিল, তাই হলো। চারুর জন্যে এর চেয়ে ভাল ঘর পাওয়া যাবেই বা কেমন করে?'

বেশ শান্ত সহজ স্বরে কথাটা বলেই পান মুখে দিলেন রেণুকা। কিন্তু অনন্তবাবুর সারা মুখ জুড়ে একটা জ্বালা ললাট বেয়ে ফুটে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠেন অনন্তবাবু 'ভাবতে পারিনি, মঙ্গলা বউঠান এ রকম সাংঘাতিক একটা মিথ্যুক।'

পেয়ালার চা যেন পেয় লাভরা গরম বিষ। তখনও ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। বসন্তদার মেয়ে চারুর হাতের তৈরী এই চা। পেয়ালাটাকে না ছুঁয়ে রেখে দিয়ে কাঁপতে থাকেন অনন্তবাবু। 'এ কি হলো? চারু তবে এতদিন ধরে মিছি-মিছি এসব কাণ্ড করলো কেন?'

চিপ চিপ করছে অনন্তবাবুর একটা। আর মুখটা যেন চাবুকের মার খাওয়া একটা মানুষের মুখ।

'কোথায় চারু?' একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ান অনন্তবাবু। জানালার গরাদ শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন। বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকেন, চলে যাচ্ছে বসন্তদার মেয়ে চারু।

'কি হলো? ডাকবে চারুকে?' রেণুকা জিজ্ঞেস করেন।

'আর ডেকে কি হবে? আমার সব সাধ্যি যে ফুরিয়ে দিয়ে বসে আছি।' অভিমানী ছেলেমানুষের মত ডুকরে ওঠেন অনন্তবাবু।

চারু চলে যাবার পর দুটি ঘণ্টা পার হয়ে যায়। তবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন অনন্তবাবু। রেণুকা এসে কতবার ডাক দিয়ে যান, 'এদিকে এস, বল তো আবার চা করে দিই।'

কিন্তু শুনতে পেয়ে থাকলেও সাড়া দিতে পারে না অনন্তবাবু। একলা-সুখী জগৎটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আর ভদ্রলোক নিজেও যেন বধির হয়ে গিয়েছেন।

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে সুমতির বাবা আর মা এক সঙ্গে অনন্ত মিত্তিরের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে গেলেন।

সুমতির বাবা বলেন, 'কি ব্যাপার? অনন্তবাবু কাঁদছেন কেন?'

সুমতির মা বলেন, 'শত হোক্, মেয়ের বাপ তো বটে। না কেঁদে পারবেন কেন?

'মেয়েকে তো জলে ফেলে দেন নি। বেশ ভাল ঘরেই দিয়েছেন। তবে এত কান্না কেন?'

'কে জানে কেন?'